No 153 April 1876

বামাবোধিনী পত্রিকা।

(সচিত্র)

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৫৩ সংখ্যা। | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৮৩। | ১২ শ ভাগ

সূচী।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভার সাহায্যে
ভারত সংস্কার সভা হইতে
প্রকাশিত।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার
১ সংখ্যক ভবন।
মূল্য ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহক দিগের নিকট হইতে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে একমাসের অধিক বিলম্ব হইলে মফঃস্বলের পত্রিকা বন্ধ হইবে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

৪। ষাণ্মাসিকের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ষাণ্মাসিকের এই দুই মাত্র সময় থাকিবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	২।০
মফঃস্বলের (ডাকমাশুল সমেত)	২৷৷৵

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

কলিকাতার জন্য	১৵০
মফঃস্বলের (ডাকমাশুল সমেত)	১।/০
প্রতিখণ্ডের মূল্য	।০

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১০ ম ভাগ অর্থাৎ ১২৮১ সালের দ্বাদশ সংখ্যা একত্র উত্তম বিলাতী কাপড়ে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ২৷৹ মাত্র। সামান্য রূপ বাঁধান চাহিলে ২৷৷০ টাকা লাগিবে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভারত সংস্কারক।

১২৮০ বৈশাখ হইতে এই নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র খানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছু গণ বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে জ্ঞাতব্য সমুদায় জানিতে পারিবেন।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক ...	৬৲ টাকা	৭৷৷০
" ষাণ্মাসিক ...	৩৷৷০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক ...	২৲ "	২।৵০
প্রতি সংখ্যা		।০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৫৩ সংখ্যা | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৮৩। | ১২ শ ভাগ

মৃত্যুকালীন মহাবাক্য।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচারক মহর্ষি ঈশা স্বজাতীয়দিগের ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তিনি উহাদিগের অত্যন্ত অপ্রিয় ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রেকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া অতি নির্দ্দয়রূপে নিহত করে। ঈশা যখন ক্রুশে বিদ্ধ, তাঁহার মস্তকের উপর কণ্টকের মুকুট এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর দর ধারে রক্ত বহিতেছে, তখন তিনি ঈশ্বরের নিকট তাঁহার প্রাণবধ-কারীদিগের জন্য এই প্রার্থনা করিলেন "পিতা! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে জানে না।"

সার ফিলিপ সিডনী নামক একজন অল্প বয়স্ক ইংরাজ সেনাপতি যটফেন রণক্ষেত্রে একটা গোলা দ্বারা এরূপ গুরুতররূপে আহত হন, যে তাঁহার উরুর হাড় ভগ্ন হইয়া যায়। শিবির প্রায় এক ক্রোশ দূরে ছিল, সেই অবস্থায় তাঁহাকে সেখানে লইয়া যায়। অনর্গল রক্তপাত দ্বারা তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্মকালের উত্তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। তিনি শিবিরে পৌঁছিয়াই এক গ্লাস জল আনিতে বলেন। জল পাত্র তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অধীনস্থ একটী আহত সৈনিক তাঁহার সঙ্গে নীত হইয়াছিল, সে সতৃষ্ণনয়নে গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। সার [illegible]

তখনি জল পাত্র সৈনিককে পান করিতে দিলেন এবং বলিলেন "আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন অধিক।" পরক্ষণেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

কার্ডিনাল উল্‌সী একসময়ে ইংলণ্ডে প্রভুত্ব ও ক্ষমতাতে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। রাজানুগ্রহে যতদূর ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য হইতে পারে, তাঁহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হেনরী যখন আপনার ধর্ম্মপত্নী কাথারিণাকে পরিত্যাগ করিয়া আনবোলিনকে বিবাহ করিবার প্রয়াসী হন, উল্‌সী তাঁহার সহায়তা না করাতে রাজার কোপের খর্পরে পড়েন। তাঁহার অট্টালিকা, ধনসম্পত্তি সকলি রাজাধিকার ভুক্ত হয়, তিনি নিজে সামান্য অপরাধীর ন্যায় ধৃত হইয়া রাজার নিকট আনীত হইতেছিলেন, পথে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় লন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। মরিবার সময় উল্‌সী বলেন "হায়! আমি রাজাকে আজীবন যেরূপ অচলা ভক্তির সহিত সেবা করিয়াছি, যদি তাহার অর্দ্ধেক ভক্তি দিয়া আমার ঈশ্বরের সেবা করিতাম, তিনি এ বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতেন না।"

লঙ্কাধিপতি রাবণ মৃত্যু শয্যাগত, রামচন্দ্র তাঁহার নিকট রাজনীতির উপদেশ গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। রাবণ প্রাণনাশক পরম বৈরী রামচন্দ্রকে সমাদর করিয়া আপনার জীবনের পরীক্ষায় যে সকল সার কথা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সরল হৃদয়ে বলিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে দুইটী উপদেশ দিলেন 'শুভস্য শীঘ্রং' শুভকার্য্য যত শীঘ্র পার করিবে এবং 'অশুভস্য কাল-হরণং' অশুভ কার্য্যে কাল বিলম্ব করিবে। লঙ্কেশ্বর আপনার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন "আমি স্বর্গমর্ত্ত রসাতল ত্রিভুবন জয় করিয়া সকল দেবতাকে আমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য করিয়াছিলাম। যমপুরীর ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে নরকে পাপীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত কাতর হইল, মনে করিলাম যমকে বলিয়া দিব, পাপীদিগকে আর যন্ত্রণা না দেয় এবং চৌরাশী নরক কুণ্ড বুজাইয়া ফেলিব। কিন্তু আজি নয় কালি এইরূপ করিয়া দিন গত হইল, অবশেষে হে রামচন্দ্র! তোমার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া জীবন শেষ হইল। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গ অতি সুখময় স্থান, অনেক পুণ্য বা দৈববল ভিন্ন সেখানে কেহ যাইতে পারে না, এই জন্য মনে করিয়াছিলাম পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ী

করিয়া দিব, যে যখন ইচ্ছা করিবে, স্বর্গে আরোহণ করিবে এবং আমার চির-কীর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু আজি নয় কালি করিয়া সময় অতীত হইল, শেষে হে রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে সংগ্রাম বাজিয়া আয়ু শেষ হইল। আর এক সময় মনে করিয়াছিলাম, পৃথিবীতে ক্ষীর, ইক্ষু, ঘৃত প্রভৃতি সমুদ্র থাকিতে আমার বাসভূমি লঙ্কাদ্বীপ কেন লবণ সমুদ্রে বেষ্টিত থাকিবে, অতএব লবণ সমুদ্র ছেঁচিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে ক্ষীরদ সমুদ্র স্থাপন করিব। কিন্তু আজি নয় কালি হইবে এইরূপ করিয়া দিন কাটাইলাম, অবশেষ হে দাশরথি! তোমার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইলাম, আর মনোরথ সিদ্ধ হইল না। অতএব ‘ শুভস্য শীঘ্রং ’ শুভ ইচ্ছা হইলে তখনি পূর্ণ করিবে, কদাপি কাল বিলম্ব করিবে না। আর অশুভ কার্য্যে ঠিক্ ইহার বিপরীত করা উচিত। দেখ লক্ষ্মণদেব সূর্পনখার নাক কান কাটিয়াছেন বলিয়া সে আসিয়া আমার পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তোমার ধর্ম্মপত্নী সীতাদেবীকে হরণ করিতে বলিল। আমার কেমন কুবুদ্ধি হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার কুমন্ত্রণা শুনিয়া সীতা হরণ করিলাম। ইহা না করিলে আমার রাজ্যও যাইত না, এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতির সহিত সবংশেও মরিতাম না এবং আমার নাম চিরকলঙ্কিত হইত না। অতএব অশুভ ইচ্ছা হইলে তাহা সাধনের কাল বিলম্ব করিবেক।”*

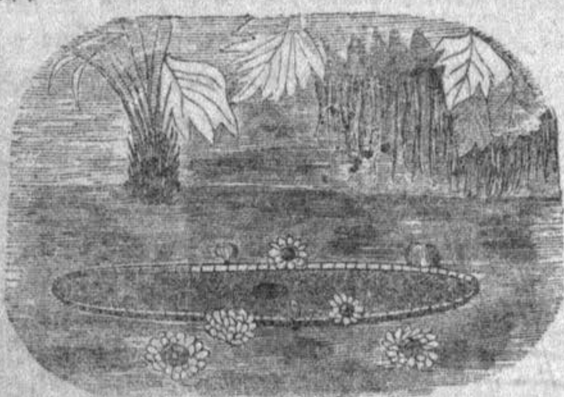
বৃহৎ জাতীয় পদ্ম।

পদ্ম সকল পুষ্পের রাজা, ইহার ন্যায় বৃহৎ পুষ্প আর কিছুই নাই। কিন্তু আমরা সচরাচর যে পদ্ম দেখিয়া থাকি, ইহা বৃহজ্জাতীয় পদ্মের তুলনায় কিছুই নয়। আমেজন নদের নিকটস্থ হ্রদাদিতে এই পুষ্প সচরাচর পাওয়া যায়। এই পদ্মের পাতার পরিধি ১২ হাত, ইহার শুভ্রবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পুষ্প সকল জলের উপরে মৃণালাসনে হাসিতে থাকে। ইহার পাতা এরূপ দৃঢ়

* রাবণের কথার মধ্যে অনেক পৌরাণিক বর্ণনা থাকিলেও ইহার নীতি সকলকে আদরের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বা, বো, স।

যে একটী শিশু তাহার উপর সচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারে, তথাপি তাহা জলে ডুবিবে না। পদ্ম দিনেই ফোটে, রাত্রে মুদিত হয়। কিন্তু বৃহৎজাতীয় পদ্ম যত রাত্রি হয়, তত ফুটিতে থাকে। প্রথমে তাহার বর্ণ শুভ্র, তৎপরে গোলাপী এবং সর্ব্বশেষে গাঢ় লোহিত হয়।

এই পদ্ম হইতে এক প্রকার সুগন্ধ উত্থিত হইয়া বায়ুকে আমোদিত করে। তিন দিন পরে ফুল বিশীর্ণ হইয়া জলমগ্ন হয় এবং বীজ পক্ক হইতে থাকে। আমেরিকার আদিমবাসীরা এই বীজ ছাড়াইয়া লয় এবং দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে।



এই পদ্ম আবিষ্কারের এইরূপ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল এক পথিক আমেজন নদের তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে জঙ্গলাবৃত একটী গুপ্ত হ্রদ দেখিতে পায়। এই হ্রদ অতি সুন্দর বৃহজ্জাতীয় পদ্মে পূর্ণ ছিল। তিনি দেখিয়া এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে জলে ঝাঁপ দিয়া ফুল তুলিবার জন্য লোলুপ হইলেন। দেশবাসীরা তাঁহাকে নিরস্ত করিল এবং একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় কি ভাসিতেছে দেখাইল। একটী কুম্ভীর রৌদ্র পোহাইতেছিল। পথিক নিকটবর্ত্তী হইলে জলমধ্যে আকর্ষিত ও ভক্ষিত হইতেন। তিনি নিকটস্থ গ্রামে একখানি ডোঙ্গা ভাড়া করিলেন। হ্রদে ডোঙ্গা ভাসাইয়া এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের পাতা ও ফুল তুলিতে লাগিলেন। পাতা এত বড, যে ডোঙ্গাতে ২ টার অধিক ধরিল না। পথিক এই পুষ্পের বীজ ইংলণ্ডে আনয়ন করেন। কিউ উদ্যানে সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়,

সেখানে কতকগুলি বীজ পাঠাইয়া দেন। একটী পুষ্করিণীতে হাফর করিয়া তাহাতে বীজ বপন করা হয়, পুষ্প সকল অতি সুন্দর জন্মিয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে এই ফুলের নাম ভিক্টোরিয়া রিজিয়া হয়। এই পদ্ম কলিকাতার গঙ্গাপারে কোম্পানির বাগানে একটী সরোবরে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা আমেরিকার পদ্মের তুল্য বৃহৎ না হউক, ইহা দেখিয়াও দর্শকগণ অত্যাশ্চর্য্য হইয়া থাকেন।

হিন্দু বিবাহ।

কাহার সহিত কাহার বিবাহ নিষিদ্ধ।

হিন্দুদিগের মধ্যে এখন যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিকে, বৈশ্য বৈশ্যকে এবং শূদ্র শূদ্রকে বিবাহ করেন, এক বর্ণের পুরুষ অন্য বর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে না, পূর্ব্ব কালে এ নিয়ম ছিল না। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' নীচকুল হইতেও গুণবতী স্ত্রীলোককে গ্রহণ করা হইত। বৈদিক সময়ে সকল বর্ণেরই মধ্যে বিবাহ চলিত। পৌরাণিক সময়েও উচ্চ জাতির পুরুষ নিম্ন জাতীয় স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয়কন্যা দ্রৌপদী যখন স্বয়ম্বর সভায় অর্জ্জুনকে বিবাহ করিতে যান, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিয়াছিলেন। এরূপ আরো কত শত দৃষ্টান্ত আছে। তবে সবর্ণ পাইলে অসবর্ণ বিবাহ হইত না। আর নীচ বর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারিতেন না, এই মাত্র নিয়ম ছিল। অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ হিন্দুদিগের পতনের সময় অর্থাৎ কলিযুগেই হইয়াছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,

" সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং।
দ্বিজানা মসবর্ণাসু কন্যাসু পরমস্তথা।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥

সমুদ্র ভ্রমণ, গৃহস্থদিগের কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অসবর্ণ বিবাহ, পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই সকল কার্য্য পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন।

অসবর্ণ বিবাহ যাহা চিরকাল হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা রহিত হইবার মূল কি? বোধ হয় কলিযুগে ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছ জাতিদিগের অধিক সমাগম হইতে লাগিল, তাহাদিগের সহিত মিশিয়া হিন্দু জাতির পাছে বিলোপ বা কলঙ্ক হয়, এইজন্য বোধ হয় জাতি বন্ধন আরো দৃঢ়তর করা হয় এবং প্রত্যেক বর্ণ যাহাতে আপনার আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারে, তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়।

মনুর ব্যবস্থায় অসবর্ণ বিবাহের বিধি আছে। শূদ্র কেবল সবর্ণ বিবাহ করিবে, এইরূপ শাসন আছে।

এক ক্ষেত্রে যেমন এক প্রকার বীজ বপন করিলে ফসল উত্তম হয় না, সেইরূপ এক গোত্রের স্ত্রীপুরুষ বিবাহিত হইলে বলিষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট গুণান্বিত সন্তান উৎপন্ন হয় না, ইহা হিন্দুরা অনেক কাল অবধি জানিতেন। এই জন্যে যাহাদের মধ্যে রক্তের সংস্রব আছে, তাহাদিগের বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পিতার সপিণ্ড, সগোত্র এবং সমান প্রবর এবং মাতামহের সপিণ্ড ও সমানোদকের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

যে সাত পুরুষকে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করা যায়, তাহাদিগকে সপিণ্ড বলে। এক ঋষির নামীয় বংশ সগোত্র। প্রবর গোত্রের শাখা। 'সমানোদক' যাহাদিগের তর্পণ করা যায়। ইহা চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্তই গণ্য হইয়া থাকে। সগোত্রাদির বিবাহ অতি জঘন্য বলিয়া হিন্দু সমাজে পরিচিত আছেঃ—

সমান গোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্যচ।
তস্যামুৎপাদ্য চণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

সগোত্রা ও সমানপ্রবরা বিবাহে ও তাহার সংসর্গে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যায় এবং তদুৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল হয়।

বৌধায়নের মতে না জানিয়া পিতার সগোত্রাকে বিবাহ করিলে তাহাকে মাতৃবৎ পালন করিতে হইবে।

এই জন্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছেঃ—

অসপিণ্ডাচ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে।

মাতার অসপিণ্ডা এবং পিতার অসগোত্রা রমণী দ্বিজাতিদিগের বিবাহ ও সংসর্গ নিমিত্ত প্রশস্ত।

পরিণীয়ো সগোত্রাস্তু সমান প্রবরাস্তথা।
তস্যাং কৃত্বা সমুৎসর্গং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
মাতুলস্য সুতাঞ্চৈব মাতৃ গোত্রাস্তথৈবচ।

সগোত্রা ও সমানপ্রবরা এবং মাতুল কন্যা ও মাতৃ সগোত্রাকে বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে।

পিসীর ও মাসীর কন্যাকে বিবাহ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপালন করিবে।

রক্তের সংস্রব যত দূর পর্য্যন্ত আছে, তাহা পরিত্যাগ করা হিন্দু বিধিসিদ্ধ। তবে তত অধিক দূর পর্য্যন্ত বিচার করিতে না চাহিলে একান্তপক্ষে উপদেশ এই:—

সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥

হে রাজন্! পিতৃপক্ষের সপ্তমী ও মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাবিধি বিবাহ করিবে। অর্থাৎ পিতৃকুলের সাত পুরুষ এবং মাতৃকুলের পাঁচ পুরুষের মধ্যে শ্রাদ্ধে না বাধে এমত দেখিয়া কন্যা গ্রহণ করিবে। দ্বিজাতির যাহা বিহিত, শূদ্রেরও তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজী প্রবচন।

১। অভাব উদ্ভাবনের প্রসূতি।

২। ঘোলাটে জলে মৎস্য ধরিও না।

৩। বাতির দুই দিক্ জ্বালিও না।

৪। ছুঁচার ঢিবিকে পর্ব্বত করিও না।

৫। নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিত আশা করিও না।

৬। আত্ম প্রশংসার ঢাক বাজাইও না।

৭। ব্যথিত পদে ভ্রমণ করিও না।

৮। সাঁতার না জানিলে ডুব জলে যাইও না।

৯। নূতন হাকিম, নূতন হুকুম।

১০। কোন ব্যক্তি দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না।

১১। যারা শুনিয়াও শুনে না তাদের চেয়ে কালা কেহ নাই।

১২। যারা দেখিয়াও দেখিতে চায় না, তাদের চেয়ে অন্ধ কেহ নাই।

১৩। কোন গুলাব কণ্টক বিহীন নয়।

১৪। মনের ইচ্ছা থাকিলে কিছুই অসম্ভব নয়।

১৫। কিছু ত্যাগ করিতে চাহিও না, কিছু লাভও করিও না।

১৬। সকল অপব্যয় অপেক্ষা সময়ের অপব্যয় অপকৃষ্ট।

১৭। দুইটী অনিষ্টের কমটী গ্রহণ কর।

১৮। একটী কুদৃষ্টান্তে অনেক সদুপদেশ বিনষ্ট করে।

১৯। দুপর রাত্রির পূর্ব্বের ১ ঘণ্টা ঘুম, পরের দুই ঘণ্টার সমান।

২০। একজনের আহার অন্যের বিষ।

২১। একটী কণ্টকে আর একটী কণ্টক বাহির হয়।

২২। একটী পীড়িত মেষ সমুদায় পালকে নষ্ট করে।

২৩। আড়ালে ঘৃণা করা অপেক্ষা স্পষ্ট ভর্ৎসনা করা ভাল।

২৪। সুযোগ লোককে চোর করে।

২৫। সুবিধা ছাড়িলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

২৭। ধৈর্য্য সকল ব্যথার ঔষধ।

২৮। যেমন বৃক্ষ তেমনি ফল।

২৯। প্রতীকার অপেক্ষা নিবারণ ভাল।

৩০। অহঙ্কার বিনাশের পূর্ব্বে গমন করে।

৩১। দীর্ঘসূত্রিতা সময়ের চোর।

৩২। দুরবস্থার জন্য প্রস্তুত হও, ভাল অবস্থা আপনাপনি প্রস্তুত হইবে।

৩৩। হঠাৎ ক্রোধ সর্ব্বনাশ-জনক।

৩৪। শীঘ্র কাটতি হইলেই বণিক্ বড় মানুষ হয়।

৩৫। রোমনগর এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই।

৩৬। ক্ষুধাকে দমন কর ও জিহ্বাকে শাসন কর।

৩৭। বৎসর গত না হইলে তাহার কুফলের গণনা করিও না।

৩৮। অন্যের গুণানুসন্ধান এবং নিজের দোষানুসন্ধান কর।

৩৯। যে পর্য্যন্ত না পাও, পরিশ্রম কর, পরিশ্রম বিফল হইবে না।

৪০। আত্মরক্ষা স্বভাবের প্রথম নিয়ম।

৪১। চোর ধরিতে চোর নিযুক্ত কর।

৪২। আপনার স্থানে বৈস, কেহ তোমাকে উঠাইতে পারিবে না।

৪৩। নির্লজ্জ অভিলাষ পূরণের উপায়ও নির্লজ্জ।

৪৪। মিথ্যাবাদীকে দেখাইয়া দেও, তাহাকে চোর প্রমাণ করিয়া দিব।

৪৫। মৌন কোন হানি করে না।

৪৬। শীঘ্র পাকিলে শীঘ্র পচে।

৪৭। ভাল করিয়া জমাও, ভাল করিয়া খরচ কর।

৪৮। বাক্য সকলের আছে, কিন্তু চিন্তা অল্প লোকের।

৪৯। গায় দিবার লেপ যেমত লম্বা, সেইমত পা খেলাও।

৫০। লৌহ গরম থাকিতে থাকিতে পেট।

বিবিধ শিক্ষা।

১। যে কার্য্য করিতে স্থির করিয়াছ, তাহার আরম্ভ কর, কার্য্যের সুবিধা হইবে। সকলের মনে রাখা উচিত, আরম্ভ না হইলে কখন শেষ হইতে পারে না। বাগানের প্রথম আগাছাটী উপড়ান, ক্ষেত্রে প্রথম বীজটী বপন, সেবিংশ ব্যাঙ্কে প্রথম টাকাটী দেওয়া এবং পথের প্রথম মাইল চলা এ সকল যদিও সামান্য, কিন্তু মহৎ ফলদায়ক। যে কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছ তাহা আরম্ভ করিলে আগ্রহের পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার সহিত আশা, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আপনা হইতে আইসে; সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হয়। কত ব্যক্তি স্বভাব সংশোধন এবং বৈষয়িক উন্নতি 'সাধনের কত উপায় কল্পনা করিয়া থাকে, যদি তাহা ধরিয়া কার্য্য করিত, তাহারা মহৎ ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারিত। কিন্তু আজি নয় কালি করিয়া কার্য্যের আরম্ভ কখনই হয় না, তাহাদিগের উন্নতিরও কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

২। কেবল চক্ষু দ্বারা দেখিলে ৩০০০ নক্ষত্রের অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। ছয় প্রকার আকারের নক্ষত্র দেখা যায়, তন্মধ্যে ২০ টা প্রথম এবং ৭০ টা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। যতদিন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তত দিন এই পর্য্যন্ত জানা ছিল। কিন্তু এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া অসংখ্য

ক্ষুদ্র নক্ষত্র দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। লর্ড রসের দূরবীক্ষণ দ্বারা এত দূরস্থ নক্ষত্র দেখা গিয়াছে, যে (যদি আলোকের গতি প্রতি সেকণ্ডে লক্ষ ক্রোশ আইসে ধরা যায়,) উক্ত নক্ষত্রের কিরণ এই পৃথিবীতে আসিতে ১৪ হাজার বৎসর গত হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের মতে ৬০০০ বৎসর জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে!!

৩। সমুদ্রের গভীরতা—সার জেম্‌স রোস সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা মাপেন। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের ৯০০ মাইল পশ্চিমে একটী স্থানের গভীরতা ৩০,৩০০ ফিট অর্থাৎ প্রায় ৬ মাইল হয়। উত্তমাশা অন্তরীপের ৩০০ মাইল পশ্চিমে একটী স্থানের গভীরতা মাপিতে ৪৯॥ মিনিট যায় অর্থাৎ ১৩,৩,৫৬ মাইল মাপা হয়। কাপ্তেন ডেনহাম রাইও জেনিরো ও উত্তমাশা অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিকের গভীরতা মাপেন, ইহা ৪৪২৩৬ মাইল হয়, হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর ২৮০০০ মাইল, ইহা হইলে সমুদ্র গর্ভে ২ টী হিমালয় ডুবিয়া যায়। পণ্ডিত লাপলাসের মতে সমুদ্রের মোট গভীরতা ৪।৫ মাইল, যদি জলের পরিমাণ আর সিকি বাড়িত, তাহা হইলে সমুদায় পৃথিবী জলময় হইত, তাহার কেবল দুই একটা পর্ব্বত জাগিয়া থাকিত।

৪। কোন বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, মনুষ্যের জীবনের পরিমাণ তাহার নাড়ীর গতি দেখিয়া ঠিক্ করিয়া বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের পরমায়ু গড়ে ৭০ বৎসর। নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে গড়ে ৬০ বার ধরিলে সমুদায় জীবনে মনুষ্যের নাড়ী ২২০৭,৫২০,০০০ বার চলিবে। কিন্তু অমিতাচার বা অন্যান্য কারণে নাড়ীর গতি দ্রুততর হইতে পারে। যদি মিনিটে নাড়ী ৬০ বারের পরিবর্ত্তে ৭৫ বার চলে, ৫৬ বৎসরে নাড়ীর নির্দ্দিষ্ট গতি শেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং পরমায়ু ১৪ বৎসর কমিয়া যাইবে। অধিক পরিশ্রম, অপরিমিত পান ভোজন এবং অন্যান্য অত্যাচার করিয়া লোকে অল্পায়ু হইয়া থাকে।

৫। তমাক সেবনে মানুষের অপকার হইলেও ঘোড়ার বড় উপকার হয়। ১৭৬০ সালে উইলিয়ম ইলিস নামে একজন ইংরাজ কৃষক ও অশ্ব-

বৈদ্য একখানি চিকিৎসাপুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে লেখেন প্রতিদিন ঘোড়ার ক্ষুরে এক কাঁচ্চা করিয়া তমাক দিলে ৭ দিনে তাহার গার পোকা, ক্ষুরের দোষ দূর হইবে এবং ক্ষুর শক্ত হইবে।

৬। মৎস্য, মাংস, ফল ও তরকারী সকল বহুদিন টাট্‌কা রাখিবার সহজ উপায়—এই সকল দ্রব্য কিঞ্চিৎ জল বা তাহাদিগের নিজের ২ রসে ফুটাইতে হয়, পরে তাহা টিন বা কাচ পাত্রের মধ্যে এমন করিয়া বদ্ধ করিতে হয় যে, ভিতরে এক বিন্দু বাতাস না যায়। ইহা হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিলে বা বহু দূরের পথে লইয়া গেলেও ঐ সকল দ্রব্য পচিয়া বা নষ্ট হইয়া যাইবে না।

৭। এক আকারের একই অক্ষর যদি সাদা কাগজের উপর কাল অক্ষরে এবং কাল কাগজের উপরে সাদা অক্ষরে ছাপান যায়; সাদা অক্ষর কাল অক্ষর অপেক্ষা বড় দেখাইবে এবং অধিকতর দূর হইতে পড়া যাইবে। ইহার কারণ কেবল আলোকের বিকীরণ শক্তি। চক্ষুর তলা যত প্রশস্ত, উজ্জ্বল বস্তুর প্রতিবিম্ব তদপেক্ষা অধিক দূর বিস্তারিত হয় এবং কাল বস্তুর প্রতিবিম্ব যে স্থান অধিকার করে, তাহার উপরেও উজ্জ্বল বস্তুর প্রতিবিম্ব বিস্তারিত হইয়া পড়ে। সাদা অক্ষর এই কারণে বাস্তবিক যত বড়, তদপেক্ষা অধিক বড় দেখায়।

৮। অনেক বহু দর্শনে এই বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছেঃ—হাজার লোকের মধ্যে ২০ জন প্রতি বৎসর মরিয়া থাকে। ৩০ বৎসর পরে কোন নগর বা গ্রামের লোক সংখ্যা পুনরায় নূতন হয়। বৃদ্ধ লোকদের গ্রীষ্মকালে যদি ৪ জন মরে, শীতকালে ৭ জন মরিবে। প্রত্যেক দেশের চতুর্থাংশ লোক অস্ত্রধারণে সমর্থ। স্ত্রীলোক ১০০ জন মরিলে পুরুষ ১০৮ জন মরিবে। স্ত্রীলোকেরা প্রায় ৬০ বৎসর বাঁচে। তৎপরে যদি বাঁচিয়া থাকে, পুরুষদের অপেক্ষা তাহারা কম মরিবে। যত মনুষ্য জন্মে, তাহার অর্দ্ধেক ৭ বৎসর হইবার পূর্ব্বে মরিয়া যায়। ৩১২৫ জন লোক মরিলে তন্মধ্যে ১ জন শত বৎসর বয়স্ক পাওয়া যায়। নিম্ন ভূমি অপেক্ষা উচ্চ প্রদেশে অধিক বৃদ্ধ লোক দেখা যায়।

উপন্যাস-কুললক্ষ্মী।

(১৪৭-১৪৮ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

হেমলতার অনুমান সত্য, বস্তুতঃই কুললক্ষ্মীর বিমাতাও পাড়ার অন্যান্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ একত্র হইয়া কুললক্ষ্মী কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া নানা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিল। কুললক্ষ্মী তাহাদের কথা বাহির হইতে শুনিয়া বড় ভীত হইয়া ধীরে ধীরে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেরই মুখ আরক্তিম হইল; কুললক্ষ্মীর বিমাতা একেবারে ধাইয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশে ধরিলেন, বলিতে লাগিলেন "কুলাঙ্গারী!" তুই আমার মান খোয়ালি, আমার নাক কান সব কাটালি, জানিস্ না, তোর সম্বন্ধ করেছে, সে বরটী একজন বিশিষ্ট কুলীনের ছেলে, তোর এম্নি দুশ্চরিত্রের কথা শুনিলে তোকে কেন বিয়ে কর্‌বে? যাতনায় ও দুঃখে কুললক্ষ্মীর বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল, সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল "হে করুণাময় বিনোদকে কোথায় রাখিলে? তোমার এ দুঃখিনী কন্যাকে কে রক্ষা করিবে?" কুললক্ষ্মীর মাতা বলিলেন "নির্লজ্জা! এখনও বিনোদকে ডাকিস্? তাকে যমালয় পাঠান হয়েছে। ফের বিনোদকে ডাকিস্ তো তোকেও সেখানে পাঠাব।" কুললক্ষ্মীর বিমাতা আর বাড়াবাড়ি করিলেন না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন শীঘ্র ওর বাবার নিকট সংবাদ দেওয়া যাক্, বিবাহটা দিয়া ফেলিলেই সোজা হইয়া আসিবে। পরে আপন ভ্রাতা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে কুললক্ষ্মীকে শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিতে হইবে, আপাততঃ একটী ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা যাক্, তা হলে আর কোন ভয় নাই। কুললক্ষ্মীকে বলা হইল তোমার বাপ চিঠী লিখেছেন, তোমাকে বড় ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। শীঘ্র চল গৌণ করিলে ভাল হইবে না। কুললক্ষ্মী ধীরে ধীরে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অনাথনাথ দীনবন্ধুকে ডাকিতে ২ ঘরে চলিল। ভাবিতে লাগিল, হায়! বড় ঘরই কি আমার শ্মশান হইবে।"

পাঠিকা ভগিনি! কুললক্ষ্মীর বর্ত্তমান অবস্থা পরে শুনিবেন, এক্ষণে কুললক্ষ্মী কে? এবং কেন এত কষ্ট পাইতেছে? তাই শুনুন। কুললক্ষ্মীর

মাতা কে এবং মাতুলালয় কোথা কেহ জানে না অধিক কি তাহা কুললক্ষ্মীও অবগত নয়। কুললক্ষ্মীর পিতাকেসকলেই জানে, কেননা তিনি সাহবাজ নগরস্থ একজন বিশিষ্ট কুলীন, তাঁহার নাম সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়; জীবিকা বিবাহ। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৫৯ বর্ষের ন্যূন হইবে না, ১২ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া এ বয়সে ৩৫ টী বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই ভাটি অঞ্চলের, ১০। ১১ টী মাত্র মাত্র বিক্রমপুরের ভারী ২ শ্রোত্রিয় এ ং কুলীন দুহিতা। তাঁহার পত্নীগণ সকলেই পিত্রালয়ে বাস করেন, তিনি আপন গর্ভধারিণী এবং চারিটী বিমাতা ও দুই তিনটী বৈমাত্র ভগিনীসহ সাহবাজনগরে বাস করেন, তাহার কন্যা সন্তানের মধ্যে সেই গৃহকন্ধা কুললক্ষ্মী মাত্র। পুত্র ১০। ১১ টী আছে।

ভাটিঅঞ্চলে তিনি বিবাহ করিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবাহের পরে আর সেখানে ২। ১ বারের অধিক যান নাই। যাহাহউক এক্ষণে কুললক্ষ্মীর বিষয় শুনুন। উনবিংশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাতা ও দুইটী ভগিনীসহ যাত্রীর দলে মিশিয়া কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। পথে সঙ্গীদিগেকে হারাইয়া দস্যু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হন। দস্যুরা তাঁহার নিকট যে কিছু পাথেয় ছিল অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বেশ্বর কোন মতে কাশীতে উপস্থিত হইয়া এক দিন "বাঙ্গালি টোলা" বেড়াইতে গিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত পরিচিত হইলেন। ব্রাহ্মণের একটী যুবতী কন্যা ছিল, অর্থাভাবে কুলীন পাত্র আনিয়া তাহাকে বিবাহ দিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন সর্ব্বেশ্বর ভাল কুলীন এবং অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, ইহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব। এই মনে করিয়া তিনি সর্ব্বেশ্বরকে নিজ বাসাতে সমাদরে বাস করাইলেন এবং কয়েক দিন তাহার চরিত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া একদিন কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বেশ্বরের অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, সুতরাং বিপুলানন্দে ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছু দিবস পরে তিনি ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া ৭০ টী টাকা হস্তগত করিলেন। সর্ব্বেশ্বর মাতার

অনুরোধে এক বৎসর কাশী বাস করিয়া ব্রাহ্মণের অতি কষ্টে সঞ্চিত অর্থ ভোজন করিলেন। সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত, এমন সময় ব্রাহ্মণ তনয়ার একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। সর্ব্বেশ্বর কন্যা দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন, কেননা তাঁহার কুল রক্ষা করিবার জন্য একটী কন্যার বড় প্রয়োজন ছিল। সর্ব্বেশ্বর ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া দেশে গমন করিলেন যে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলেই তিনি আপন স্ত্রী ও কন্যা নিজ দেশে লইয়া প্রতিপালন করিবেন। সর্ব্বেশ্বর দেশে যাইয়া বিবাহের কথা প্রায় বিস্মৃত হইলেন, এমন সময় কাশী হইতে এক পত্র আসিল, তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে, তিনি মৃত্যু সময়ে একজন আত্মীয়ের হস্তে কন্যাটী সমর্পণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন ইহার স্বামীর নিকট পত্র লিখিবেন এবং তিনি আসিলে তৎসঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন। সর্ব্বেশ্বরর নিকট ক্রমে ক্রমে ৩।৪ খানা পত্র আসিল, তিনি যেন শুনিয়াও শুনিলেন না; বিশেষতঃ স্ত্রীকে প্রতিপালন করা যে অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম তাহা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কন্যার জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন, কারণ তদভাবে তাঁহার কুল যায় ২ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের আত্মীয় দুইবৎসর সর্ব্বেশ্বরের প্রতীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। তাহার বাটী কাশীতেই ছিল। ব্রাহ্মণের সেই আত্মীয়ও অল্প দিবস পরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের পত্নীর ক্লেশ পাইতে হইল না, সেই আত্মীয় ব্যক্তির হেমচন্দ্র নামে একটী শিক্ষিত পুত্র ছিলেন, তিনি এই নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণতনয়াকে কন্যাসহ আপন ভগিনীবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ভগিনী কিছুই ছিল না এবং তিনি বিবাহও করেন নাই, সুতরাং একমাত্র সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রীই তাহার সংসার চালাইতে লাগিলেন। হেম বাবু কন্যাটীর নাম সরলা রাখিলেন এবং তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মাতার উত্তেজনায় এবং কন্যাটীকে আনিবার আশায় কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার পত্নীর বাসস্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হেম বাবু শুক দরবার দর্শন করিতে অমৃত সহরে গমন করিয়াছিলেন। বাড়ীতে একটী

মাত্র চাকর ছিল। সর্ব্বেশ্বর পত্নীকে বলিলেন যে আমার বাড়ীতে চল, পরের বাড়ী থাকিয়া কাজ নাই। কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাতে সম্মতা হইলেন না, তিনি বলিলেন হেম বাড়ী না আসিলে যাওয়া কিরূপে হইবে, সে কি মনে করিবে? আপনি কিছু দিন থাকুন, পরে সে আসিলে যাইব। সর্ব্বেশ্বর বলিল তবে কন্যাটীকে দেও, আমার মাতা ইহাকে দেখিতে চান, দেখাইয়া আবার আনিব। কিন্তু তাহারা ইহাতে একেবারে কাঁদিতে লাগিল সুতরাং সর্ব্বেশ্বর মনে করিলেন যে অপহরণ করা ব্যতীত আর উপায় নাই। তিনি ২ মাস কাশীতে থাকিয়া কন্যা অপহরণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং এক দিন রজনীতে সরলাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বুঝিলেন যে ইহা স্বামীর কর্ম্ম। আপনার সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলেন। পরে হতাশ্বাস হইয়া হেম বাবুর নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে দেখিলেন হেম বাবুর ওলাউঠা হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এক বন্ধু এই পত্র খানা লিখিয়াছেন। সরলার আর অনুসন্ধান হইল না। তাঁহার মাতা বিষম বিপদে পড়িলেন। সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় হৃষ্টমনে কন্যা আনিয়া মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাহার দ্বারা কুল রক্ষা হইবে বলিয়া তাহার সরলা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কুললক্ষ্মী নাম রাখিলেন। কুললক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন এবং মাতা কোথা? এই প্রশ্ন মধ্যে মধ্যে করিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বসমীপে বলিয়াছিলেন যে কুললক্ষ্মীর মাতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং কুললক্ষ্মীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিতেন তোমার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন। কুললক্ষ্মী বড় শান্ত ছিল, কেহ মারিলে বা তিরস্কার করিলে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিত। পিতা কুললক্ষ্মীর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। বিবাহ হইবার দুই দিবস পূর্ব্বে সেই বরের মৃত্যু হইল সুতরাং কুললক্ষ্মী অবিবহিতা রহিলেন। বরের মৃত্যু হইলে কুলীনের কন্যার ঘর ভিন্ন বিবাহ হইতে পারে না, তবে অনেক টাকার দ্বারা নূতন ঘর করিলে হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর নির্ধন, বিবাহ করিয়া যে কিছু পান তাহা সাংসারিক খরচেই ফুরাইয়া যায়। সাহজাদনগরে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন,

তাঁহার পুত্র বিনোদ কুললক্ষ্মীর অপেক্ষা ৬ বৎসরের বড়। তিনি শৈশবকাল হইতেই কুললক্ষ্মীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ তাহার মা নাই দেখিয়া সুশীল বিনোদ আরও অধিক ভাল বাসিতেন। কুলকে কেহ মারিলে বিনোদ তাহাকে মারিতেন, কুললক্ষ্মী মা মা বলিয়া কাঁদিলে বিনোদেরও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইত. বিনোদ অতি দয়ালু ছেলে বলিয়া সাহবাজনগরস্থ সকলেই তাহার প্রশংসা করিত। বিনোদ প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া নিজ মাতুলের সহিত কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, অচিরেই বিনোদ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। বিনোদ সাহ-বাজ নগরে থাকিতে কুলকে একটু একটু পড়িতে শিখাইতেন, আহ্লাদ-বশতঃ প্রথমতঃ কেহ বাধা প্রদান করিতেন না সুতরাং বিনোদের যত্ন সফল হইল, কুললক্ষ্মী অল্প দিনেই সুন্দর রূপে বাঙ্গালা শিখিলেন। বিনোদ কলিকাতা যাওয়ার পরেও কুললক্ষ্মী নিজ যত্নে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে অনেক বাধা পাইতে হইত। বিনোদ ছুটীর সময় সাহবাজনগরে থাকিতেন, সেই সময় কুললক্ষ্মীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিতেন। কুললক্ষ্মীর নিকট বিদ্যা ও ধর্ম্ম উভয় প্রিয় ছিল। বিনোদ কুললক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং কুললক্ষ্মীও বিনোদকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, কুললক্ষ্মী মনে করিতেন এ সংসারে বিনোদই তাহার আপনার লোক। বিনোদ কুলীন পুত্র, সুতরাং চারিদিক্ হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু তিনি বাল্য বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার পিতা ও পিসী বলিলেন "পাঠ শেষ হইলে বিবাহের কথা।" যাহাহউক ৩।৪ বৎসর বিনোদ বিবাহের হস্ত হইতে মুক্ত পাইলেন। সকলে চুপি ২ বলিতে লাগিল বিনোদ বুঝি কুললক্ষ্মীকে বিবাহ করিবে। দুই এক জনে কৌতুক করিবার জন্য বিনোদের পিতার নিকট এই কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন "তাহা কি সম্ভব, আমরা তত উচ্চ কুলীন নই যে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দুহিতা আমার পুত্র বিবাহ করিতে পারেন।" দুই এক জনে কুললক্ষ্মীর পিতার নিকটেও এই প্রস্তাব করিল। তিনি বলিলেন "কাহার এতাদৃশ ভাগ্য যে আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে?

বামন হইয়া চাঁদ হাত? কন্যাকে কাটিয়া ফেলিব, তবু আমি জীবিত থাকিতে ইহা হবে না।"

বিনোদের সমবয়স্কেরা বিনোদকে বিবাহের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। এ দিকে কুললক্ষ্মীর পিতাও কুললক্ষ্মীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং কোনরূপে ৩।৪ শত টাকা হস্তগত করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ এক প্রকার স্থির করিলেন। বর মধ্যপাড়া নিবাসী খুব ভাল কুলীন, বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর, চারিটী মাত্র বিবাহ করিয়াছেন। কুললক্ষ্মী সমবয়স্কাদের নিকট বলিলেন "আমার বিবাহ হইয়া কাজ নাই, আমি চিরকাল কুমারী থাকিব।" কুললক্ষ্মীর পিতা মনে করিলেন যে বিনোদের প্রতি ভালবাসাতেই কুললক্ষ্মী এইরূপ বলিতেছে। অতএব বিনোদ যাহাতে কুললক্ষ্মীর নিকট পত্র লিখিতে এবং সাক্ষাৎ করিতে না পারে এমন স্থানে রাখা উচিত। তিনি এই স্থির করিয়া কুললক্ষ্মীকে ১ বৎসর যাবৎ বজ্রযোগিনীতে আপনার এক শ্বশুরালয়ে রাখিয়াছিলেন এবং এক বৎসর কাল বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে ছিলেন। কিন্তু কুললক্ষ্মী কোন মতেই স্বীকৃতা হয় নাই। বিনোদেরও একটী সম্বন্ধ একেবারে ঠিক হইল, বিনোদ জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্দে আসিয়াছিলেন সেই মাসেই তাহার পিতা বিবাহের দিন ধার্য্য করিলেন, বিনোদ সেই বিবাহ এড়াইবার জন্যে এবং কুললক্ষ্মীর বর্ত্তমান ক্লেশ মোচনের কোন উপায় করিবার জন্যে বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের শুভদৃষ্টি।

সম্প্রতি আমাদিগের দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ দুইটী কার্য্য করিয়াছেন। প্রথম, ছাত্রীবৃত্তিস্থাপন দ্বিতীয়, বালিকাবিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা নিয়োগ। বালিকাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা ও পরীক্ষার উপযুক্ত পারিতোষিক দান না হইলে তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে

পারে না। এ দেশের বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা করিবার মেধা আমরা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বালিকারা বালকদিগের অপেক্ষা যে কোন অংশে নিকৃষ্ট এরূপ বোধ হয় হয় নাই, প্রত্যুত সমান সুবিধা পাইলে সমবয়স্ক বালক অপেক্ষা বালিকা অধিক শিক্ষা করিতে পারে, ইহাই আমাদিগের অনুভূত হইয়াছে। বালকদিগের পাঠনা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, উত্তরোত্তর পরীক্ষা করিবার এবং পারিতোষিক দানেরও ব্যবস্থা আছে, বালিকাদিগের সেরূপ কিছুই নাই, সুতরাং বালিকাদিগের অপেক্ষা বালকেরা অধিক শিক্ষানৈপুণ্য প্রকাশ করিলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। এ দেশে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা বালিকাদিগের পরীক্ষা ও পারিতোষিক দানের প্রণালী সর্ব্ব প্রথমে রীতিমত প্রতিষ্ঠা করেন, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। গবর্ণমেণ্ট এই হিতকরী সভার সৎদৃষ্টান্তে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য যেমন নিম্ন শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর তিন প্রকার পরীক্ষা ও পারিতোষিকের নিয়ম আছে, বালিকাদিগের জন্যও সেইরূপ হইবে। বালকদিগের যে সকল পাঠ্য পুস্তক আছে, বালিকাদিগকেও তাহা পাঠ করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। উভয়ের পাঠের প্রভেদ এই, বালকদিগের জন্য উচ্চ অঙ্গের গণিত ও বিজ্ঞানের স্থলে বালিকাদিগের সূচিকার্য্যের পরীক্ষা হইবে। ছাত্রবৃত্তি হিসাবে যত টাকা থাকে, তাহার অনধিক চতুর্থাংশ বালিকাদিগের জন্য প্রদত্ত হইবার অনুমতি হইয়াছে। বালিকারা বালকদিগের ন্যায় এক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া বৃত্তি লইয়া অন্য স্থানের উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা এক স্থানে থাকিয়া যাহাতে ছাত্রীবৃত্তি উপভোগ ও শিক্ষার উন্নতি করিতে পারে, তাহার নিয়ম হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আপাততঃ বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী এবং ঢাকা এই তিন বিভাগে ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে, কারণ এই তিন বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার সমধিক উন্নতি হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখিলে অন্য অন্য বিভাগেও এ রীতি প্রবর্ত্তিত হইবে। ছাত্রীবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার যে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহ দান করা হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু বালিকাদিগের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য বালকদিগের হইতে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলে আমাদিগের মতে ভাল হয়। বালিকাবিদ্যালয় সকলে এখন যে প্রকার পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক স্থির হওয়া আবশ্যক। যেমন গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে বালিকাদিগের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইরূপ অন্য দুই একখানি পুস্তক অথবা পাঠ্যের সীমা পরিবর্ত্তন করিলে যদি আপাততঃ বালিকাগণের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক হয়, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বালিকাদিগের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া যদি বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কেবল আশা দিয়া নিরাশ করিবেন। বালকদিগের ছাত্রবৃত্তি সংখ্যাও তত অধিক নহে, তাহা হইতে টাকা কাটিয়া বালিকাদিগকে দিলে তাহারাই বা কি পাইবে, ইহারাই বা কি পাইবে? তদপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট বালিকাদিগের নিজস্ব করিয়া যদি কিছু স্বতন্ত্র বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহাহইলে কোন গোলযোগ হয় না।

গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় অনুগ্রহ ইনস্পেক্‌ট্রেস্‌ বা পরিদর্শিকা নিয়োগ। বঙ্গদেশে রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী প্রথম পরিদর্শিকা পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর কন্যা বটেন, কিন্তু একটী ইংরাজের সহধর্ম্মিণী। ইহাঁর স্বামীর নামানুসারে ইহাঁর নাম বিবী হুইলার। বাঙ্গালী ও ইংরাজী নাম একত্র হইয়া ইহাঁর নাম মনোমোহিনী হুইলার হইয়াছে। যাহাহউক মনোমোহিনী অতি সুশিক্ষিতা ও গুণবতী রমণী, তিনি পদের যথার্থ উপযুক্ত। ইংরাজ কন্যা এ পদ পাইলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম না, কারণ বাঙ্গালী মেয়েদিগের শিক্ষার পরীক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য নহে। হিন্দু গৃহের বধূও এ কার্য্যের ভার গ্রহণে অসমর্থ, কারণ তিনি বিদ্যাতে পারদর্শিনী হউন, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন, সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া পরিদর্শন কার্য্যও যে উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিবেন, তাহারও আশা করা যায় না। নূতন পরিদর্শিকা আপাততঃ কলিকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণার বালিকা বিদ্যালয় সকল

পরিদর্শন করিবেন। মনোমোহিনী হুইলার তাঁহার পদোচিত কার্য্য সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাহ করিতে কৃতকার্য্য হউন, আমরা অন্তরের সহিত জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত পিতা ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির ন্যায় উপযুক্ত দেশহিতৈষী বাঙ্গালীদিগের পরামর্শ লইয়া বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থাদি করেন, ইহা দেখিলে আমরা আহ্লাদিত হই। স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী স্থিরীকরণের এখনও অনেক বিষয় অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষ বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিশেষে সার রিচার্ড টেম্পল্‌ বঙ্গদেশের গবর্ণর হইয়া বাঙ্গালীদিগের সর্ব্ব প্রকার হিতকর কার্য্যে যেমন উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেছেন, সেইরূপ দুর্ভাগা রমণীদিগের কল্যাণ বিধানার্থও অগ্রসর হইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। তিনি যে সুনিয়মের সূত্রপাত করিলেন, তাহার কিরূপ কার্য্য হয় দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার অন্যান্য অভাব বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বালুকারণ্য।

পৃথিবীতে যেমন সমুদ্র আছে, জল ভিন্ন তথায় আর কিছুই দেখা যায় না, জঙ্গল আছে, ঘন বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; সেইরূপ বালুকারণ্য আছে, বালুকা ভিন্ন তথায় আর কিছুই নাই। বালুকারণ্য মরুভূমি, তথায় একটী বৃক্ষ বা তৃণ উৎপন্ন হইতে পারে না, একটী জীব বাস করিতে পারে না, তথায় একটী বিহঙ্গের সুস্বর বা মক্ষিকার গুণ গুণ শব্দ ও শ্রুত হয় না, কিন্তু দক্ষিণে বালুকা, বামে বালুকা সম্মুখে বালুকা, পশ্চাতে বালুকা, পদতলে বালুকা, চারিদিকে বালুকা ধূ ধূ করিতেছে। মস্তকের উর্দ্ধদিকে প্রচণ্ড সূর্য্য অগ্নিময় কিরণ বর্ষণ করে, কিন্তু তাহাকেও জ্বলন্ত বৃহৎ বালুকাপিণ্ড বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরে ভয়ানক ঘূর্ণা বায়ু উত্থিত হইয়া বালুকারাশি দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে এক করিয়া ফেলিয়া থাকে। পৃথিবীতে যদি কিছু ভীষণতম দৃশ্য থাকে, সে

এই বালুকারণ্য, কিন্তু ইহা দৃশ্য হইয়াও অদৃশ্য, কেন না ভ্রমণকারীকে সর্ব্বক্ষণই অন্ধ করিয়া ফেলে, তাহাকে আপনার করাল মূর্ত্তি দেখিতে দেয় না। বালুকারণ্য উষ্ণপ্রধান দেশেই সুবিস্তৃত রাজ্যরূপে বিস্তৃত দেখা যায়। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে দিল্লী হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত একটী বালুকারণ্য আছে। ইহা ভ্রমণ করিতে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। চিন তাতারে গবি নামক এক অতি বৃহৎ বালুকাময় মরুভূমি আছে। কিন্তু আরব ও আফ্রিকাতে ইহা যেরূপ ভীষণ আকারে প্রসারিত রহিয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি নহে। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে এই স্থান এরূপ ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করে যে তাহা বর্ণনা করা যায় না, সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন আসিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে বোধ হয়। মরুভূমি সকলের মধ্যে মধ্যে দ্বীপের ন্যায় এক একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড আছে, তাহার ভাব ঠিক্ উহার বিপরীত। তাহাতে রসাল বৃক্ষাদি, সুন্দর পানীয় জলপূর্ণ জলাশয়, এবং শীতল ছায়া ও বায়ু-প্রবাহ পথিকের মনে স্বর্গের শোভা অঙ্কিত করে। বালুকারণ্য মধ্যস্থ দ্বীপাবলিতে মনুষ্যের বাসও আছে। এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানের অব্যবহিত সন্নিধানেই এরূপ মনোহর স্থান কেবল সৃষ্টিকর্ত্তার অপার করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বালুকারণ্য যদিও নীরস বালুকাতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এক সময়ে ইহা জলময় সমুদ্র ছিল, সমুদ্র হইতে বাষ্প উঠিয়া ক্রমে তাহার লবণাংশ পড়িয়া থাকে এবং কালে এক এক সমুদ্রের জল সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায় ও তাহা বালুকারণ্যে পরিণত হয়। জগদীশ্বরের অপার কৌশল! তিনি নগরকে সমুদ্র এবং সমুদ্রকে নগর করিতেছেন। আবার জলময় সমুদ্রকে নীরস বালুকারণ্যে পরিণত করিতেছেন। এক সময়ে বালুকারণ্যও অগাধ জলপূর্ণ সমুদ্র হইবে আশ্চর্য্য কি? এই সকল ঘটনার কার্য্যকারণ সর্ব্বক্ষণই চলিতেছে, কিন্তু এক একটী পরিবর্ত্তন হইতে হয়ত লক্ষ বৎসর অতীত হইয়া যায়। পৃথিবী যে কত দিনের কে বলিতে পারে?

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বালুকারণ্য সাহারা। ইহা আফ্রিকার উত্তরাংশে কর্কটবৃত্তের উভয় দিকে স্থাপিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৩০০০ এবং

প্রস্থ ১০০০ মাইল। ইহার আয়তন সমুদায় আফ্রিকার পঞ্চমাংশ হইবে। ইহার উত্তরে মরক্কো, দক্ষিণে সেনিগাল নদী, পশ্চিমে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং পূর্ব্ব দিকে লোহিত সমুদ্র।

পৃথিবী ভ্রমণকারী সুবিখ্যাত হবোণ্ট সাহারার বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—"বালুকারণ্যের প্রথম অংশ অনাবৃত সমতল পাষাণময় ভূমি, পর্য্যটক তাহার উপর দিয়া অনেক দিন গিয়াও বালুকার চিহ্ন দেখিতে পায় না, উপরে আকাশ এবং নীচে কেবল কঠিন মৃত্তিকা দেখিতে পায়। তৎপরে নুড়ি পাথরে পূর্ণ প্রশস্ত ভূমি, তাহার ভিতরে মধ্যে মধ্যে ৩০ ফিট নিম্ন উপত্যকা দেখা যায়। ইহা পার হইয়া গেলেই বালুকার সমুদ্র, তাহাতে লবণের পরিমাণ এত অধিক যে সমস্ত ভূমি লবণাবৃত বোধ হয়, দেখিতে ঠিক্ যেন শুভ্র বরফাচ্ছন্ন বিস্তৃত দেশ। মধ্যে মধ্যে হরিৎবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত এক এক খণ্ড ভূমি দেখা যায়, তাহা তালগাছ ও জলের উৎস দ্বারা সুসজ্জিত। এই দুই প্রকার ভূমির দৃশ্য এত আশ্চর্য্য বিভিন্ন, যে কবিরা নৈরাশ্য ও আশার দৃষ্টান্ত ইহা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জীবন বালুকারণ্যের তুল্য এবং তন্মধ্যে সম্পদ এক একটী সুন্দর উদ্ভিদ ও জলপূর্ণ দ্বীপ। পথিক যখন বালুকারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া যায়, ধূলাতে কণ্ঠরোধ হয়, তাপ ও দারুণ তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া যায়, তখন এইরূপ একটী স্থান দেখিলে কি আহ্লাদিত হয়, কি আনন্দের সহিত তথায় পদার্পণ করে! কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ঘোর ঝঞ্ঝা, তাহাকে উড্ডীয়মান বালুকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় তাড়িতেছিল, মরীচিকা বারংবার প্রলোভন দেখাইয়া প্রবঞ্চনা করিতেছিল, সহস্র সহস্র ভ্রমণকারীর মৃত দেহ তাহার পথ ছাইয়াছিল এবং প্রতিক্ষণে মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিতেছিল। হঠাৎ সে যে স্থানে আসিয়া পড়িল, তথায় নির্ম্মল সলিলে কম্পমান বৃক্ষপত্রের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, হরিদ্বর্ণ তৃণশয্যায় ভূমিকে আশ্চর্য্য শোভান্বিত করিয়াছে, পুষ্পশোভিত সুপক্ক ফল ভরাবনত সহস্র সহস্র নিবীড় পল্লবাবৃত শাখা সম্মিলিত হইয়া চক্ষু পীড়নকারী সূর্য্য কিরণকে প্রতিরোধ করিয়াছে; যে বাতাস অগ্নিকুণ্ডের শিখার ন্যায় বালুকাময় ভূমির উপরে শরীর দগ্ধ করিতেছিল, তাহা এখন

স্নিগ্ধ ও সুগন্ধময় হইয়া পথিকের অঙ্গ শীতল ও সকল পর্য্যটন ক্লেশ দূর করিয়া দিতেছে।

মরুভূমির মধ্যে এই প্রকার হরিৎ ভূমিখণ্ড ব্যতীত মস্তক রাখিবার একটু স্থান আর কোথাও নাই। কিন্তু এরূপ ভূমিখণ্ডও অতি অল্প সংখ্যক। যে গুলি আছে, তাহারও অধিকাংশ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহাতে লবণাক্ত অল্পমাত্র জল পাওয়া যায়। অন্য ঋতুতে জলাশয়ের ধারে উদ্ভিদ অবিলম্বে উৎপন্ন হইয়া জল শুকাইতে দেয় না। এই কারণে এই অরণ্য দিয়া সকল সময়ে যাইবার সুবিধা নাই। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে টিম্বকটু হইতে টাফিলেট এবং ফেজান হইতে বোর্ণোতে যাত্রী সকল প্রায় গমনাগমন করিয়া থাকে।

বালুকারণ্যে বৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানেও প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। আফ্রিকার নীল নদের নিকটে কেবল দুই এক স্থানে বৃষ্টি হয়। সমুদ্রের উপর বায়ু যেমন সংবৎসর এক দিকে বয়, ইহার উপরেও বায়ু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নিয়ত বহিয়া থাকে এবং সেই দিকে বায়ুস্তম্ভ উঠিয়া থাকে। মিসর দেশীয় এক প্রকার কণ্টকবৃক্ষ অরণ্যের প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এক জন গ্রন্থকার বালুকারণ্যে এক দিন কাটান কিরূপ কষ্টকর, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "বালুকারণ্যের ভিতরে পড়িয়া কোন্ দিকে গিয়া বিশ্রাম স্থান লাভ করিবে, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পার না। প্রথম ২। ৩ দিন ছোট ছোট গুল্ম দেখিতে পাও, তৎপরে তৃণশূন্য প্রশস্ত মাঠে আসিয়া পড়ে। কত কত পাহাড় নূতন উৎপন্ন হইয়াছে, কত কত উপত্যকা গত সপ্তাহের ঝটিকা দ্বারা খনিত হইয়াছে, পাহাড় ও উপত্যকা সবই বালি, বালি, বালি, কেবল বালি, বালির পর বালি, তাহারই উপর দিয়া যাইতে হয়। পৃথিবী এরূপ বালুকাময় যে আকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলিত করিতে হয়, কিন্তু সে আর কিছুর জন্য নয়, কেবল 'পরিত্রাহি' বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার জন্য। সূর্য্যের দিকে তাকাইতে হয়, তিনি খাটাইবার মনিব। তাহাকে দেখিয়া কি পরিমাণে কিরূপ খাটুনি খাটিতে হইবে, ঠিক্ করিয়া লইতে হয়। প্রাতঃকালে তাঁবু ফেলিলেই তিনি উপস্থিত হন। তুমি উষ্ট্র পৃষ্ঠে

আরোহণ করিয়া চল, তিনি পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকেন এবং সমস্ত দিন কাজ করিতে হইবে বলিতে থাকেন। তার পর অনেক ক্ষণ আর তাঁহার সহিত দেখা নাই। কারণ তোমার মুখ চক্ষু ঘোমটায় ঢাকা, তাঁহার উজ্জ্বল মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিতে পার না। কিন্তু তা বলিয়া তিনি কাছে নাই, মনে করিবার যো নাই, জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দ্বারা মস্তক সর্ব্বদা বিদ্ধ করিতে থাকেন। মুখে কথা নাই, তোমার আরব সঙ্গীরা গোঁয়াইতে, থাকে তোমার উষ্ট্রেরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তোমার চর্ম্ম পুড়িতে থাকে এবং স্কন্ধ ফাটিয়া পড়ে, যে রেশমের ঘোমটায় মুখ ঢাকা, তাহাই দেখ এবং তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের আলোকে এক একবার অতি কষ্টে উঁকি মার। কিন্তু দিন চলিয়া যায়, সূর্য্য ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে আসিয়া দেখা দেয় এবং কোমলকরে তোমার হস্ত ধারণ করিয়া পারস্য রাজ্যের দিকে সুদীর্ঘ ছায়াপাত করিয়া চলিয়া যায়। (ক্রমশঃ)

হেক্তর ও ইন্দুমুখী।

(১৪৭ সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর)

এতেক বলিয়া বীর সমুৎসুক মনে,
প্রসারেন বাহু, কোলে লইতে নন্দনে;
মস্তকে মুকুট ভাতি ঝকমক্ করে,
ভয়ে শিশু কান্দিয়া ধাত্রীরে আঁটি ধরে,
দেখিয়া দম্পতী মৃদু হাসিলা পুলকে
হেক্তর সত্বর সুস্থ করেন বালকে।
মস্তক হইতে " ভয় " করি উন্মোচন,
রাখিলা মুকুট ভুমে ঝলসে নয়ন।
আগ্রহে চুম্বিয়া সুতে, তুলি শূন্য-দেশে
প্রার্থনা করেন বীর দেবের উদ্দেশে !—
" হে দ্যু লোক পতি বিভু সর্ব্ব শক্তিমান্ !
হে অমর বৃন্দ। রক্ষ আমার সন্তান !

আশীর্ব্বাদ করো যেন আমার সমান
রক্ষিবারে পারে জয় রাজ্য-পাট মান!
দেশ বৈরী-বিপক্ষেতে করিয়া সমর
ভবিষ্যতে হয় যেন দ্বিতীয় হেক্তর!—
এ রূপে সংগ্রাম-জয়ী হইয়া যখন,
আসিবে ফিরিয়া বাসে নাশি বীরগণ;
জয়-ধ্বনি করি লোকে বাড়া'বে সম্মান,
বলিবে, 'পিতার চেয়ে বীর বলবান!'
সন্তানের জয় ধ্বনি শুনি জয়ময়,
উথলিবে জননীর প্রফুল্ল হৃদয়!"
এত বলি বীরবর, সতৃষ্ণ নয়নে
চাহি প্রিয়া-পানে, কোলে দিলেন নন্দনে!
যতনে প্রাণের ধনে বুকেতে করিয়া,
সান্ত্বিলা সুন্দরী, ফিরি চাহেন হাসিয়া!
ভয়েতে নীরব শিশু শান্ত ভাব ধরে,
পুলকে মাতার নেত্রে অশ্রু-বিন্দু ঝরে!
আকুল বীরেন্দ্র তাহা করি দরশন
মুছাইয়া মৃদুভাবে করেন সান্ত্বন!—
"ইন্দুমুখি! জীবনের জীবন আমার!
বিদরে হৃদয় দুঃখ দেখিলে তোমার!
অসময়ে কেন প্রিয়ে! কর বিলাপন!
কাল-পূর্ণ না হলে কি মরে কোন জন?
থাকিতে সময় কার সাধ্য হিংসা করে?
পূর্ণ হ'লে পরমায়ু আপনিই মরে!
যে দিন যখন যার কাল পূর্ণ হ'বে,
অমনি আসিয়া মৃত্যু কবলিয়া ল'বে!
না মানিবে কোন বাধা, কাকুতি মিনতি,
না শুনিবে কোন কথা, নিষ্ঠুর নিয়তি!

বলেতে উপেক্ষা তার করিবার নয়,
ধন-জনে বশীভূত কখন না হয়,
কিছুতে তাহার গতি না হয় বারণ,
পলাইলে ত্রাণ নাই অবশ্য মরণ!
মর্ত্ত্য-লোকে নিয়তির অধীন সবাই,
জন্মিলে মরিতে হবে, অব্যাহতি নাই!
কেহ ক্ষণ, কেহ দিন, কেহ বর্ষ পরে,
কেহ বা শতায়ু কেহ দুই শত ধরে;
চিরদিন ভব ধামে, না রহিবে কেহ,
সমভাবে নাশ হ'বে সকলের দেহ!
ধনী-দীন, রাজা-প্রজা, ঋণী—মহাজন,
মূর্খ—সূক্ষ্ম-বুদ্ধিধারী, সাধু—অভাজন,
ভীরু—সাহসিক আর বীর-হীনবল,
সমভাবে মৃত্যু আগে নমিবে সকল!
তাই বলি, প্রাণপ্রিয়ে! স্থির কর মন।
অকারণ বিলাপনে কিবা প্রয়োজন!
সুস্থ হ'য়ে শশিমুখি, যাহ নিজালয়ে,
গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাক অন্যমনা হ'য়ে!
সমর আমারে প্রিয়ে, করিছে আহ্বান,
যাই চলি, হাসি কর বিদায় প্রদান!
বিলম্বে বিপদ রাশি বাড়িছে কেবল!
রণ-ক্ষেত্র পুরুষের পুরুষার্থ-স্থল!—
যথা বীরগণ ঘোর করিতেছে রণ,
সকলের অগ্রে আমি করিব গমন—
নামেতে যেমন অগ্রগণ্য সবাকার,
তেমতি বিপদে অগ্রে আহ্বান আমার!"
বলিতে বলিতে বীর সত্বর হইয়া,
মস্তকে মুকুট পুন পরেন তুলিয়া;

সান্ত্বিয়া প্রাণের ধনে বিবিধ যতনে,
বিদায় চুম্বন ল'য়ে বাহিরিলা রণে,
পাছে অমঙ্গল হয় ভাবিয়া অন্তরে,
নয়নের জল রামা নয়নে সম্বরে।
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি যেন প্রাণ বাহিরায়,
অনিচ্ছায় প্রাণেশ্বরে দিলেন বিদায়!
সতৃষ্ণ নয়নে ঘন চান বার বার,
বাষ্পে রোধে আঁখি দৃশ্য নাহি চলে আর।
ধীরে ধীরে ফিরে যান আবাসে আপন,
শোকে অবসন্ন হৃদি করে বিলাপন,
কাঁদে বামা, কাঁদে সাথে পুরনারী গণ
জীয়ন্ত হেক্টর-শোকে মরণ ক্রন্দন।

সমাপ্ত।

নূতন সংবাদ।

১। ১২৮৩সালের ১ লা বৈশাখ লর্ড লিটন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া গবর্ণর জেনেরল ও মহারাণীর প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সুমিষ্ট বাক্য, ও শিষ্টাচার দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছেন। আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনারল এক জন বিখ্যাত কবি এবং ভারতবর্ষকে বহু কবি ও পণ্ডিতের জন্মভূমি বলিয়া সমাদর করেন। তিনি এখন সহধর্ম্মিণী ও ৩টী শিশু কন্যার সহিত সিমলা পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহার রাজত্ব ভারতের মঙ্গলের কারণ করুন্।

২। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় লর্ড বিশপ মিলমানের পশ্চিমাঞ্চলে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি দেশীয় সমাজের ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইহাঁরই সাহায্যে ইহাঁর ভগিনী কুমারী মিলমানের দ্বারা ভবানীপুরে একটী বালিকাবিদ্যালয় সুন্দররূপে চলিতেছিল। সেটী বোধ হয় বন্দ হইবে।

৩। ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়া এখন আপনাকে ভারতেশ্বরী বলিয়া পরিচিত করিবার অভিলাষ প্রকাশ

করাতে 'Empress of India' অর্থাৎ ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া তাঁহার নূতন উপাধি স্থিরীকৃত হইয়াছে। আগামী ২৪ এ মে মহারাণীর জন্ম দিনে তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র তোপধ্বনি হইয়া তাঁহার এই উপাধি ঘোষিত হইবে।

৪। সম্প্রতি কলিকাতায় লোক সংখ্যা গণনা হয়। অধিবাসীর সংখ্যা ৪,২৩,০০০ হইয়াছে।

৫। বঙ্গদেশের রমণীগণ অপেক্ষা মন্দ্রাজের স্ত্রীলোকগণ অধিক উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন। পন্থম জনাকাম্য রগাম্মিহা নাম্নী একটী মান্দ্রাজী বিদ্যাবতী রমণী স্বামি সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণের চিহ্ন স্বরূপ 'পিক্চর অব ইংলণ্ড' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

৬। ভারতহিতৈষী বাবু কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে যুবরাজের স্মরণার্থ আলবার্ট 'হল' নামে একটী গৃহ গত ১০ ই বৈশাখ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। ইংলণ্ডেশ্বরী অনেক দিনের পর আপনার শ্বশুরালয় জর্ম্মনি দর্শন করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

৮। যুবরাজ গত ২০ বৈশাখ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ হইতেছে।

৯। বেবারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী হুইলার কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হুগলীর বালিকা বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। সোমপ্রকাশ পত্রে এই কয়েকটী ঔষধ প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠিকাগণের জানিয়া রাখিলে উপকার দর্শিতে পারেঃ—

(১) টাকের মহৌষধ—মস্তকে টাক ধরিতে আরম্ভ হইলে, সেই স্থানে বিচুটীর ডাঁটা বা ফল রগড়াইয়া দিবে। দিনের মধ্যে দুই বার দিবার বিধি। প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় এইরূপ ৩।৪ দিন দিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

(২) বৃশ্চিক দংশন—বৃশ্চিক যে স্থলে কামড়াইবে, সেই স্থলে জীবিত মক্ষিকা রগড়াইয়া দিবে।

(৩) মুখব্রণ—স্থলপদ্মের পাপড়ী দিনে দুই তিন বার করিয়া ব্রণের উপর ৩।৪ দিন দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

(৪) ছারপোকা বিনাশ—বাদা-

মের পাতা জলে ভিজাইয়া দ্রব্যাদিতে মাখাইবে, এবং সেই রস সমস্ত গৃহে ছড়াইবে, তাহা হইলে কিছু দিন ছারপোকা আর গৃহে দেখা দিবে না। ঐ পাতার রসে গন্ধক মিশ্রিত করিলে, নিশ্চয়ই ঐ কীট একেবারে বিনষ্ট হইবে।

১১। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ফিয়ার সাহেবের পত্নী লেডী ফিয়ার এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের একজন পরম বন্ধু। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ইঁহার যাইবার পূর্ব্বে বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষের বাটীতে ইঁহার সম্মানার্থ একটী সভা হয়, তথায় দেশীয় বিদ্যার্থিনী অনেকগুলি রমণী কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দান করেন।

পুস্তক সমালোচনা।

১। হিতোপাখ্যান মালা ২য় ভাগ, পারস্য পুস্তক বুঁস্তা হইতে সঙ্কলিত। দৃষ্টান্তের সহিত উপদেশ প্রদান করিলে অধিকতর ফলোপধায়ী হয়। এই পুস্তকে আমরা যেমন তাহার সমীচীন উদাহরণ দেখিতেছি, এইরূপ আর অল্প পুস্তকে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার সুনীতি ইহা হইতে শিক্ষা করা যায়, বিশেষতঃ ইহা পাঠ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা বর্দ্ধন করিবার উপায় লাভ করা যায়। এই পুস্তকখানি বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্য মধ্যে সন্নিবেশিত হইবার উপযুক্ত। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ নীতগর্ভ উৎকৃষ্ট পুস্তক নারীগণের জন্য বিশেষ আবশ্যক, এই গ্রন্থ দ্বারা সে অভাব অনেকটা পুর্ণ হইয়াছে। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ এ গ্রন্থ খানি অধ্যয়ন করিয়া উপকৃত হইবেন।

২। শিশুসন্তানের শিক্ষা বিষয়ে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, বাবু গিরিশ চন্দ্র সেন দ্বারা প্রকাশিত। এক খানি মহম্মদীয় পুস্তক হইতে ইহা অনুবাদিত। ইহার উপদেশ সকল পিতামাতাদিগের পক্ষে জানা উচিত, তদ্দ্বারা তাঁহারা বালক বালিকাদিগের অনেক ইষ্টসাধন করিতে পারিবেন। মুসলমান দিগের গ্রন্থে এরূপ সুনীতি ও সদাচারের উপদেশ আছে, দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

বামাগণের রচনা।

নববর্ষ।

পরিয়া নূতন সাজ নবীন রাজন।
সুবিশাল বিশ্ব রাজ্য করিতে শাসন॥
হাসিতে হাসিতে আসি হইল উদয়।
প্রফুল্ল প্রকৃতি দেবী তাহার প্রভায়॥
নানা আভরণ পরি সাজিয়া যতনে।
যাইতেছে ধীরে ধীরে বরিতে রাজনে॥
নব পত্রে তরুগণ শোভিত সুন্দর।
গাইছে বিহগ গীত শ্রুতি মনোহর॥
সমীরণ মৃদু মৃদু বহিয়া বহিয়া।
নৃপতি মঙ্গল বার্ত্তা যাইছে ঘোষিয়া॥
আমোদে উন্মত্ত হয়ে নাগরিকগণ।
করিতেছে স্থানে, স্থানে মঙ্গলাচরণ॥
চলিলে বিরাশি ওহে ভারত ছাড়িয়া।
নিজ রাজ্য নিজ ধন অপরে সঁপিয়া॥
আশীর্ব্বাদ করি যাও বঙ্গবাসীগণে।
সদা যেন সুখে তারা থাকে প্রাণে প্রাণে॥
নবরাজ! এবে তব নবীন উৎসাহ।
সতত কুশলে কার্য্য করিবে নির্ব্বাহ॥
নবীন যুবকগণ নব আশা করে।
কায় মনে ব্রতী হবে দেশহিত তরে॥
মোহ নিদ্রা পরিহরি ভারত সন্তান।
শুভ কার্য্য তরে সদা হবে যত্নবান্॥
সাধিবে দেশের হিত সকলে মিলিয়া
মাননীয় হবে তারা সুপুত্র বলিয়া॥
ভারত অবলাগণ সদা বিষাদিনী।
বঙ্গদেশে জনমিয়া সতত দুঃখিনী॥

নাহি আশা নাহি সুখ নাহিক সহায়।
ভাগ্য তাহাদের প্রতি অতি নিরদয়॥
তাহাদের দুঃখ রাশি করিবে মোচন।
তোমার কুশল তারা করিবে কামন॥
সুনিয়মে নবরাজ্য করিবে শাসন।
প্রজা হিত কাজ সদা করিবে সাধন॥
তবে তো স্নেহের পাত্র হইবে সবার।
সুযশ তোমার সদা হইবে প্রচার॥
বঙ্গবাসী প্রতি ঘরে সুখেতে থাকিবে।
রাজার মঙ্গল চিন্তা নিয়ত করিবে॥
জগদীশ করিবেন তোমার মঙ্গল।
নিয়ত করহে তুমি বঙ্গের কুশল॥

কৃষ্ণনগর শ্রীপ্রসন্নময়ী।

বঙ্গীয়া ভগ্নীগণের প্রতি উপদেশ।

এস বঙ্গ ভগ্নীগণে, হরষিত হয়ে মনে,
ঈশ্বরের লইগে শরণ।
সুখেতে থাকিব সবে, কোন দুঃখ নাহি রবে,
এড়াইব শমন ভবন।
ভয়ানক দেশাচার, রবেনা রবেনা আর,
অন্তর্হিত হইবে নিশ্চয়।
যাইবে যতেক পাপ, হৃদয়ের অনুতাপ,
আর হবে ধর্ম্মের উদয়॥
কপটতা দূরে যাবে, অন্তর নির্ম্মল হবে,
মনে প্রীতি পাবো সর্ব্বক্ষণ।
[illegible] ভগ্নী গণ, হয়ে আনন্দিত মন,
কর তাঁর নাম উচ্চারণ॥
বিপদ ভঞ্জন বই, দেখ আর গতি কই,
এ ভবে পাইতে পরিত্রাণ।

কেবা আছে হেন জন,   রক্ষা করে সেই ক্ষণ,
যে সময় বাহিরাবে প্রাণ ॥
মাতাপিতা বন্ধুগণে,   যত্ন করি অনুক্ষণে,
তথাপিও রাখিতে নারিবে।
ছাড়িয়া সবার মায়া,   ত্যজি এ অলীক কায়া,
বন্ধুগণে ফেলিয়া যাইবে ॥
তাই বলি সকলেরে,   বিশুদ্ধ হয়ে অন্তরে,
পড়ি এসো চরণে তাঁহার।
দয়াময় দয়া করে,   সদয় হইয়া নরে,
পাপ হতে দিবেন নিস্তার ॥
আমাদের প্রতি ভাই,   দয়া তাঁর সর্ব্বদাই,
এক ভাবে আছে সর্ব্বক্ষণ।
না ভোলেন কভু তিনি,   কিবা দিবা কি রজনী,
অকাতরে করেন রক্ষণ ॥
সেই দয়াময় প্রতি,   সদত রাখহ মতি,
ত্যাগ করি কুসংস্কার চয়।
বৃথা কাল্পনিক ভাবে,   পূজিলে কি ফল পাবে,
নাহি হবে ধর্ম্মের উদয় ॥
অতএব এস ভাই,   যাতে সবে ত্রাণ পাই,
সেই চেষ্টা করি হে যতনে।
দয়াময় চরণেতে,   এস বলি সকলেতে,
ক্ষমা কর পাপিনী সন্তানে ॥
এ ভব সাগরে ভাই,   তাঁভ বিনা গতি নাই,
আমাদের নাহিক উপায়।
অসীম তাঁহার স্নেহ,   বলিতে না পারে কেহ,
প্রণাম করহ তাঁর পায় ॥

শ্রীমতী হরিমতি চট্টোপাধ্যায়   কাল্না।

... AT THE EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৫৫ সংখ্যা। | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৮৩। | ১২ শ ভাগ

ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন উপাধি গ্রহণ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর উপাধি এত দিন 'Queen' অর্থাৎ রাজ্ঞী ছিল, এখন তিনি 'Empress' অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী নাম ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নাম কিন্তু তাঁহার সকল রাজ্য সম্বন্ধে নহে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও অন্যান্য রাজ্য সম্বন্ধে তিনি যে রাজ্ঞী ছিলেন, তাহাই রহিলেন, কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি সম্রাজ্ঞী হইলেন। রাজ্ঞী ও সম্রাজ্ঞী নামের কি প্রভেদ তাহা পাঠিকাগণ বোধ হয় একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারেন। যিনি বৃহৎ রাজ্য শাসন করেন এবং যাঁহার অধীনে অনেক রাজা আছে, তিনি সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী নাম ধারণের উপযুক্ত। আমাদিগের দিল্লীর বাদশাহেরা সম্রাট্ ছিলেন, চিন রুসিয়া অষ্ট্রিয়া জর্ম্মণি প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরাও সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার অধিকার সমুদায় পৃথিবী-ব্যাপী, ইহা এত বড় বিস্তৃত যে কথিত আছে দিবারাত্রির কোন সময়েই তাঁহার রাজত্বের মধ্যে সূর্য্য অস্তগত হয় না। এরূপ স্থলে 'বিক্টোরিয়া' যে সম্রাজ্ঞী নাম ধারণ করিবার উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা সম্রাট্ নাম ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও অপেক্ষা যখন তিনি বল বিক্রম ও প্রতাপে ন্যূন নহেন, তখন তাঁহাদিগের তুল্য গৌরবসূচক নাম কেন না গ্রহণ করিবেন? কিন্তু ইংরাজগণ পুরাতন 'রাজ্ঞী' নামেরই পক্ষপাতী

এবং সম্রাজ্ঞী নামের বিরোধী। ‘ঘর পোড়া গোরুর’ যেমন আগুণ দেখিলে ভয় হয়, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী নামে তাঁহাদিগের সেইরূপ মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের প্রতিবাসী ফরাসীদিগের ইতিহাসে তাঁহারা দেখিয়াছেন, উহাদিগের অধিপতিরা যতদিন রাজা নামে আখ্যাত ছিলেন, ততদিন শান্ত ও ধীর ছিলেন, কিন্তু সম্রাট নাম ধারণ করিয়া বিপ্লবকারী ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। ইংরাজদিগের রাজা নামে মাত্র রাজা, কাজে ‘কলের পুতুল’ বলিলে হয়। ইংরাজজাতি তাঁহাকে যে দিকে ফিরাইবেন, তাঁহাকে সেই দিকে ফিরিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সম্রাট নাম তাঁহাদিগের অসহ্য। পাছে নামের সহিত রাজা অধিক ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠেন, এইটী তাঁহাদিগের ভয়। ইংরাজদিগের এ ভয় যে কতদূর সমূলক তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাঁহাকে তাঁহারা নামে রাজা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে কি নামে সম্রাট্ করিয়া রাখিতে পারেন না? তাঁহাদিগের রাজার নিজস্ব ধন ও বল অতি অল্প, থাকিবার মধ্যে এক মান আছে, তাঁহারা রাজাকে ‘সকল গৌরবের আকর’ বলিয়া মানিয়া থাকেন, এরূপ স্থলে তাঁহার সে মান ও গৌরব খর্ব্ব করিয়া রাখিলে তাঁহার কি রহিল?

যাহাহউক ইংলণ্ডেশ্বরী ইংরাজজাতির মনের ভাব জানিয়া কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই উক্ত গৌরবসূচক ‘সম্রাজ্ঞী’ নাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অনেক মতামতের পর তাহা পার্লেমেন্টের গ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া, অনেক গালি বিদ্রূপ ও প্রতিবন্ধক সহ্য করিয়া মহারাণীর নামের এই জয় সংসাধন করিয়াছেন। রাজ্ঞীর শুভ জন্মদিন গত ২৪ মে হইতে তিনি মহারাণী বা ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া সমুদায় সাম্রাজ্য মধ্যে ঘোষিত হইয়াছেন। অতঃপর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমুদায় দলিল পত্রে তাঁহার এই নাম লিখিত হইবে, ভারতবর্ষের মুদ্রাতে তাঁহার এই নাম অঙ্কিত হইবে, ভিন্ন দেশীয় রাজা ও সম্রাট্‌দিগের সহিত কার্য্যকালে তাঁহার এই নাম উল্লিখিত হইবে, কেবল ব্রিটিব দ্বীপ পুঞ্জের দলিল পত্র ও মুদ্রা প্রভৃতিতে তাঁহার এ নূতন উপাধির উল্লেখ হইবে না। মহারাণী বিক্টোরিয়ার এই নূতন উপাধি গ্রহণ তাঁহার নিজের এবং ভারত-

বর্ষের সম্বন্ধে একটী বিশেষ ঘটনা বলিতে হইবে। ভারতবর্ষ মহারাণীর 'রাজমুকুটের অত্যুজ্জল মণি' বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার উপাধির সঙ্গে ভারতবর্ষের নাম সংযুক্ত হওয়াতে তাঁহার গৌরব অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। অনাথ ভারতবর্ষও এতদিনের পর 'আপনার অধীশ্বরী' বলিয়া একজনকে স্ব-নামে ডাকিবার পথ পাইলেন। শতাধিক বর্ষ হইল, ইংরাজগণ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন এবং একে একে প্রায় সমুদায় প্রদেশ করতলস্থ করিয়া 'মহারাজ চক্রবর্ত্তী' হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এতদিন ভারতের অধীশ্বর বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করিতে পারা যাইত না, ভারতরাজ্য; রাজ্য সকলের মধ্যে গণনাস্থলেই আসিত না, ইংলণ্ডের নামের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণী স্বয়ং যখন ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি ভারতের বিলুপ্ত নাম উদ্ধার করিয়া আপনার অঙ্গের আভরণ করিবেন আশা ছিল,তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। এতদিন পরে সেই ঘটনা সম্পন্ন হইল, ইহাতে আমাদের মনে আনন্দোদয় হইতেছে। এখন ভারতবর্ষের সহিত মহারাণীর সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইল, ইহার প্রতি তাঁহার মমত্ব অধিক হইবে, ইংরাজজাতি ভারতবর্ষের কল্যাণকর প্রস্তাব সকল বরাবর যেমন অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, এখন আর সেরূপ করিতে পারিবেন না এই আশা হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের এই আশা আশঙ্কা-শূন্য নহে। ইংলণ্ডস্থ যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতে মহারাণীর নূতন উপাধি ভারতবর্ষের অমঙ্গলের কারণ হইবে। তিনি ইংলণ্ড প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজ্ঞী রহিলেন, তথায় কোমলভাবে শাসন করিবেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্রাজ্ঞী হইলেন, এখানকার শাসনে কঠোরতা ও যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশিত হইবে। এ কথা শুনিলে আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং আনন্দের স্থলে বিষাদ আসিয়া মনকে অধিকার করে। কিন্তু মহারাণীর মনে যে এরূপ অশুভ অভিপ্রায় আছে, ইহা আমরা কখন বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের দোষেই আমাদিগের দুঃখ। তিনি এতদিন 'রাজ্ঞী' ছিলেন, তাহাতে আমাদিগের উপর রাজপুরুষগণ যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই, পরেও যে এককালে 'গঙ্গা জল' হইবেন, এরূপ আশা করা যায়

না। যাহাহউক আমরা এখন হইতে ভারতেশ্বরীর নিকট ভারতের দুঃখ জানাইতে পারিব। ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়া রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা তিনি আমাদিগকে যে সকল উদার স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন, ভারতেশ্বরী হইয়া সে সকল যে হরণ করিয়া লইবেন ইহা কখন মনেও করিতে পারি না। আমাদিগের স্বত্বাধিকার সকল যদি অব্যাহত থাকে এবং আমরা যদি আপনাদিগের অধীশ্বরীর নিকট দুঃখ জানাইতে পাই, তাহাহইলে আমাদিগের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ কেহই রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। এখন আমরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি 'Empress of India' ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়াকে চিরজীবিনী করুন, এবং তাঁহাদ্বারা দীনহীন ভারতবর্ষের সমুদায় দুঃখ মোচন ও কল্যাণ বর্দ্ধন করুন্।

অর্থ দান।

অর্থদান করাই দয়ার এক মাত্র কার্য্য এবং অর্থদান না করিলে দয়া প্রকাশ হয় না, এ কথা যথার্থ নয়। মনে যদি দয়ার ভাব থাকে, সহস্র প্রকারে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কায়িক শ্রম করিয়া দুর্ব্বলকে সাহায্য করা, মিষ্ট কথা বলিয়া শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করা, শিক্ষাদান করিয়া অজ্ঞানের মনের অন্ধকার দূর করা, সদুপদেশদ্বারা পাপী ব্যক্তিকে সৎপথে ফিরাইয়া আনা, এক জনের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা, এ সকল দয়ার কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বলিয়া অর্থ সাহায্য যে সামান্য সাহায্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। মনুষ্যের পৃথিবীতে থাকিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই অর্থের প্রয়োজন। পৃথিবীতে দরিদ্র লোকেরা অর্থের অভাবে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। আগে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা, পরে শিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানী হওয়া বা সদুপদেশ শুনিয়া ধার্ম্মিক হওয়া! অতএব যাঁহার অর্থ আছে, দয়াপ্রকাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে নিরন্ন, বিবস্ত্র, নিরাশ্রয় লোকদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। পরে তিনি মিষ্ট বাক্য বর্ষণ বা জ্ঞান ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া দরিদ্রের অন্যপ্রকার দুঃখ দূর করুন। অর্থ থাকিতে যিনি অর্থদ্বারা পরোপকার করিতে চান না, অন্য প্রকারে দয়া প্রকাশ

করিবার আশা দেন, তিনি কেবল ফাঁকীর কথা বলিয়া ঈশ্বরকে ও দরিদ্রদিগকে প্রতারণা করেন। কে না জানে মুখের বাক্য দ্বারা বা মনের প্রার্থনা দ্বারা লোকের উপকার করিতে কিছু ব্যয় হয় না, সুতরাং তাহা অনায়াসে করা যাইতে পারে? কিন্তু অর্থ দিয়া দয়া করা কঠিন কার্য্য। মনে দয়ার ভাব আসিলেও এবং বাক্যে তাহার পরিচয় দিলেও দয়ারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠে না। একজন চতুর ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, দরিদ্রকে দুপয়সা দিয়া সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিয়াও অনেকের পকেটে হাত দিতে ২ সে ইচ্ছা জুড়াইয়া যায়, অনেকের পয়সা স্পর্শ করিয়াও হাতে তুলিবার উৎসাহ থাকে না, অল্পব্যক্তি তাহা তুলিয়া গরিবের হস্তে অর্পণ করিতে পারে। ইহাতেই বুঝা যায় মনে দয়া হওয়া বা মুখে "আহা! আহা!" বলা অপেক্ষা দুপয়সা দান করিয়া ফেলা কত কঠিন কার্য্য!

প্রাচীন কালে অর্থদান দয়ার একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল এবং অর্থ থাকিলে সাধ্যমত তাহা দান করিয়া দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে কেহ ত্রুটি করিতেন না; কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে২ লোকের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনকার অধিকাংশ লোকে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত, নিঃস্বার্থভাবে তাহা কাহাকেও প্রাণ ধরিয়া দিতে পারেন না। এখনকার দাতাদিগের অধিকাংশের দান যশের নিমিত্ত। তাঁহারা হয়ত রাজার সন্তোষের জন্য সহস্র ২ মুদ্রা অনায়াসে দান করিবেন, কিন্তু অন্নাভাবে জীর্ণকায় বা ঔষধ পথ্যাভাবে মৃতপ্রায় একব্যক্তিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও কড়ার সাহায্য করিবেন না। ক্ষমতা উপার্জ্জন যশোলাভ, অন্যের মনোরক্ষা বা সন্তোষ সাধনের জন্য যে দান তাহা দয়ার চিহ্ন নহে, তাহা দ্বারা এক কণা মাত্রও পুণ্য উপার্জ্জন করা যায় না। দুঃখীর দুঃখ দর্শনে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখ মোচন করাতেই দয়া, তাহাতেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। সাধ্য থাকিতে যিনি ইহাতে ত্রুটী করেন, তিনি আপনার কর্ত্তব্য হেলন করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। "যিনি দরিদ্রকে দয়া করেন, তিনি ঈশ্বরের দয়া লাভ করেন এবং যিনি দরিদ্রকে বঞ্চনা করেন, তিনি ঈশ্বরের দয়া হইতেও বঞ্চিত হন," ইহা যথার্থ কথা।

বর্ত্তমান সভ্যতার সময়ে অর্থ দান করা লোকের বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে দয়াশূন্য বলিতে স্বীকৃত নন। তাঁহারা অর্থ

দান না করিয়াও আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জানাইবার জন্য নানাপ্রকার ওজর আপত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নীতি শাস্ত্রবিদ্ ডাক্তার পেলী এক এক করিয়া এই আপত্তি সকলের যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেরূপে তাহা খণ্ডনের চেষ্টা পাইয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিলাম।

১। "আমাদিগের দান করিবার মত অতিরিক্ত অর্থ নাই। অর্থাৎ দান না করিয়া অন্য কোন না কোন প্রকারে ব্যয় না করা যায়, এমন অর্থ নাই—আমরা যেরূপে যাহা ব্যয় করিব ও জমাইব স্থির করিয়াছি, তাহার অধিক অর্থ নাই।" ইহা দ্বারা এইটী সপ্রমাণ হয় যে ব্যয় ও সঞ্চয়ে যত টাকা ধরিয়াছি তাহা কমান আমাদিগের স্বেচ্ছাধীন বা কর্ত্তব্য কি না, তাহা আমরা একবারও ভাবি না এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ দান যে ব্যয়াঙ্কের মধ্যে পূর্ব্বাহ্নেই ধরা উচিত ছিল, তাহা আমরা বুঝি না।

২। "আমাদিগের আপনাদিগের পরিবার আছে এবং দাতব্য গৃহেতেই আরম্ভ হয়।" পিতা আপন পরিবারের আবশ্যক অভাব সকল যাহাতে মোচন করিতে পারেন, এরূপ করিয়া আয় ব্যয় বিষয়ে মিতাচারিতা অবলম্বন করিবেন। যতদিন সেরূপ আয়ের সংস্থান না করিতে পারেন, ততদিন তিনি বদান্যতা প্রকাশে ক্ষান্ত থাকিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ একজনকে অভাবগ্রস্ত করিয়া অন্যের অভাব পূরণ করিলে সাধারণ সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। কৃপণতা প্রকাশের ওজর এই পর্য্যন্ত, ইহার অধিক ওজর গ্রাহ্য হইতে পারে না।

৩। "কেবল অর্থ দিলেই যে দয়া প্রকাশ হয় তাহা নহে, কিন্তু হিতৈষণা, জগতের মঙ্গল প্রার্থনা, সকল মনুষ্যের প্রতি ভাল বাসা, অন্তরের সদ্ভাব ইত্যাদি অনেক প্রকারেও দয়া প্রকাশ করা যায়।" যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা সেণ্ট জেমসের কথা শ্রবণ করুন্;—"তোমাদের কোন ভাই ভগিনী অন্ন বস্ত্রের জন্য অভাবগ্রস্ত হইয়া যদি তোমাদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে আইসে এবং তোমরা অন্নবস্ত্র না দিয়া মিষ্ট মুখে বিদায় করিয়া বল "যাও, তোমার অন্ন বস্ত্রের দুঃখ থাকিবে না" ইহাতে তাহার কি উপকার করিলে?"

৪। "অমুক ধর্ম্মোপদেষ্টা (সেণ্টপল) তাঁহার উপদেশের (করিন্থীয়-

দিগের প্রতি প্রথম পত্রের ১৩ অধ্যায়) অমুক অধ্যায়ে দরিদ্রদিগকে দান করিবার বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই।”

সংস্বভাবের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় উপদেষ্টা সকল কর্ত্তব্যের উল্লেখ না করিতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া দয়া করিবার ওজর করা যায় না।

৫—“আমরা গবর্ণমেণ্টকে দরিদ্রদিগের পালনার্থ ট্যাক্স দিয়া থাকি।” ইহা বলিয়া ওজর করিলে আমরা ঋণ শোধ করিয়া থাকি, বলিয়া দান করিব না, বলাও যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের দেয় রাজস্ব আয় হইতে বাদ দিয়া আমাদিগের ঠিক্ আয় ধরা কর্ত্তব্য।

৬—“আমরা অনেক দরিদ্রকে খাটাইয়া প্রতিপালন করিয়া থাকি।” যদি নিজের প্রয়োজনে খাটান না হয়, তাহা হইলে এ ওজর শুনা যাইতে পারে। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে খাটাইয়া এ কথা বলিলে ইহা যারপর নাই স্বার্থপরতার কথা।

৭। “আমরা যত ভাবি, গরিবেরা তত কষ্ট অনুভব করে না। কষ্ট সহিয়া সহিয়া তাহাদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে এবং তাহা তাহারা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে।” অভ্যাস দ্বারা কষ্ট যত সহ্য হউক, আত্যন্তিক শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাতে অবশ্যই ক্লেশ অনুভব হয়, কামারের কি অগ্নিময় লৌহ-দণ্ড স্পর্শে শরীর দগ্ধ হয় না! বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি কতদূর দুঃখ সহিতে পারে, তাহা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না, তাহাকে কতদূর সুখী করিতে পারি, ইহাই চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

৮। “দুঃখীদিগকে যত দেও, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হয় না, বা সে কথা ভাবে না।” প্রথমতঃ ইহা সত্য নয়। দ্বিতীয়তঃ কাহাকেও দয়া করা কৃতজ্ঞতা লাভের জন্য নয়।

৯—“দরিদ্রতার ভাণ করিয়া লোকে প্রতারণা করে।” আমরা ভাল অভিপ্রায়ে দান করিলে তাহাতে আমাদিগের পুণ্যের হানি হইবে না, আর দুঃখে না পড়িলে লোক ভিক্ষা করিতে আসে না।

১০—“অর্থ সাহায্য করিলে আলস্য হয়।” পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে তাহা হইতে এই কুফল উৎপন্ন হয়।

১১—নিকটে অনেক দুঃখী গরিব আছে, তাহারা থাকিতে দূরের লোককে

সাহায্য করা উচিত নয়।" এরূপ স্থলে নিকটের গরিব লোকদের কতটুকু সাহায্য করি দেখান আবশ্যক।

শাসন সমতা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (১) রাজপুরুষ বা শাসনকর্ত্তা হইলেই কেহ প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না; তাঁহাকে প্রজাদিগের স্বাধীনতা এবং স্বত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যে গুলি রাজকার্য্যের অন্তর্গত নয়, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা। রাজা যে প্রজাদিগের উপর অযথা প্রভুত্ব করেন এবং সময়ে সময়ে প্রজারাও যে রাজার ক্ষমতা অমান্য করিয়া অপরাপর প্রজার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহার কারণ এক পক্ষে বলাধিক্য। যখন শাসন তন্ত্রের কোন পক্ষের এই বলাধিক্য না থাকে, প্রত্যুত যখন রাজপুরুষ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ শক্তির সমতা থাকে যে, কোন পক্ষে আর কাহারও উপর অত্যাচার করিতে না পারে, অথচ কেহ কোন অন্যায়াচরণ করিলে অপরে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়, তখনই সমাজে "শাসন সমতা" আছে বলা যায়।

যে সমাজে এক পক্ষ প্রবল, অথচ তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে, এমন অপর কোন প্রতিযোগী পক্ষ নাই, সেখানে যে প্রবল পক্ষ যথেচ্ছাচার করিবে, অন্যায় করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বরং সেরূপ না করাই ইতিহাসে আশ্চর্য্য। শাসন সমতার অভাবে সমাজের যে কিরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়, তন্মধ্যে যে কিরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাসন সমতা অভাবে কত লোককে একজনের কোপে পড়িয়া অন্যায় বিচারে যাবজ্জীবন অসহ্য কারাবাস ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, কত লোককে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে, কত লোককে বধ্য ভূমিতে প্রাণ

(১) আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে 'রাজার ক্ষমতা কে দিল' এবং কার্ত্তিকের 'রাজকার্য্য' এই দুই প্রস্তাব দেখ।

বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, কত লোককে মৃত্যু অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ভয়ঙ্কর যন্ত্র সমূহে পেষিত হইতে হইয়াছে, কত ন্যায়-পরায়ণ বিচারককে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইয়াছে, কত শ্রেণীর লোককে অপরের দাসত্বে শরীর মন সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়াও কীটের অধম হইয়া জীবন যাপন করিতে হইয়াছে।

বস্তুতঃ শাসন সমতাই সমাজোন্নতির মূল ভিত্তি। অতএব কি উপায়ে ইহা সংস্থাপিত হইতে পারে, সকলের সে বিষয়ে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রাজনিয়ম প্রতিপালন করা অথবা অপরকে রাজশাসন উল্লঙ্ঘন করিতে না দেওয়া প্রজার যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, শাসন সমতার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার প্রতীকার করাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য; নতুবা সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে, সমাজে থাকা যে জন্য তাহা বিফল হইবে। আমরা নিজে অনধিকার চর্চ্চা করিব না, তবে অপরকেই বা অনধিকার চর্চ্চা করিতে দিব কেন? নিজে কোন বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিলে যেরূপ অনিষ্ট ঘটে, অপরে করিলেও সেইরূপ ঘটে। কিরূপে শাসন সমতা রক্ষা করিতে পারা যায় সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু সামাজিক জীব মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে সমাজ রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য তিনি সমাজে শাসন সমতা রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য।

এ সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমরা দেখিয়াছি প্রজাদিগের অভিমত না হইলে সাধারণতঃ রাজপুরুষগণ প্রভুত্ব করিতে পারেন না। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে প্রজাদিগের অনভিমত হইলেও তাঁহারা নিরবছিন্ন বলপ্রভাবে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না। দেশ ভেদে শাসন প্রণালীও ভিন্নরূপ, কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ প্রণালীটি শাসন সমতা রক্ষার অনুকূল? কিরূপ শাসন প্রণালীতে রাজা ও নানা শ্রেণীর প্রজা সমূহের পরস্পরের মধ্যে শক্তির তুল্যতা আছে? ইহার উত্তরে মোটামোটি এই বলা যাইতে পারে যে, সকল প্রকার শাসন প্রণালীতে শাসন সমতা রক্ষা হওয়া সম্ভব। বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র, সম্ভ্রান্ততন্ত্র অথবা নিকৃষ্টতন্ত্র সকলেই শাসন সমতা রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রণালীতে সমাজের একাংশের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত; সেই একাংশ, নিজ স্বার্থ সাধনার্থ বহু লোকের স্বার্থ বিস্মৃত হইতে পারে, এজন্য

তৎ কর্ত্তৃক অপরের উপর অন্যায় প্রভুত্ব প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নহে, এবং ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আবার এইরূপ শাসন প্রণালী বিপর্য্যস্ত করাও নিতান্ত কঠিন নহে। কিন্তু প্রতিনিধি শাসন প্রণালীতে অর্থাৎ যে দেশে প্রত্যেক শ্রেণীর লোক স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ ব্যক্তি বর্গকে নির্ব্বাচিত করিয়া রাজকার্য্য আলোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারে, তথায় এই সমতা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়। কেননা এরূপস্থলে সকল প্রজা সমভাবে আপনার পক্ষ সমর্থন করে। যদি কেহ কোনরূপ অন্যায় কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিতে চায়, তবে অন্যে তখনই তাহার প্রতিবাদ ও অন্যথা করিতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষা।

বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যাশিক্ষা করা কর্ত্তব্য কিনা, সে বিষয়ের বিচার করিবার সময় এক প্রকার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় অনেকেই ভালরূপ বুঝেন নাই, বিশেষতঃ পুরুষ যতদূর বুঝিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা তাহার কিছুই বুঝেন নাই। তাহার কারণ অনেক, বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতি অতি অল্প দিনই লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র; তথাপি এত অল্প দিন নহে, যে বুঝাইয়া দিলে বঙ্গদেশে বিদ্যার যথার্থ মর্ম্মজ্ঞা শতকরা অন্ততঃ পাঁচ সাতটি স্ত্রীলোক দুর্লভ থাকিত। ইহাতেই বোধ হয়, রক্ষকদিগের অযত্ন এবং শিক্ষাদানে উপেক্ষা হেতু ঐরূপ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। বাল্যকালে বালিকাবিদ্যালয়ে যতদূর শিক্ষালাভ সম্ভব, প্রায় তাহাতেই বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সুদীর্ঘ মানব জীবনের মধ্যে ৫। ৬ বৎসরের অধিক কাল পাঠ হইতে পারে না। বঙ্গবাসীগণ বিদ্যাকে অর্থকরী জানেন, সুতরাং বিদ্যা শিখিয়া স্ত্রীলোকের ধনোপার্জ্জন অসম্ভব জ্ঞানে, অধিক বিদ্যা শিক্ষা করা কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই আবশ্যক বোধ করেন না। এই ভ্রান্ত মত সকলের (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের) অন্তঃকরণ হইতে দূরীকৃত না হইলে, বঙ্গ বামাগণের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি যাহাতে আত্মোন্নতির আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারেন, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত। ইহার আবশ্যকতা বুঝিলেই আপনা আপনি

এতদ্ভাবে একটি ক্ষতি বোধ হইবে এবং উন্নতি ঐ ক্ষতিবোধেরই এক প্রকার অনুবর্ত্তী হইবে।

স্ত্রীজাতি মনুষ্য সমাজ মাত্রেরই অর্দ্ধাঙ্গ। বঙ্গসমাজে লোক সংখ্যায় স্ত্রী ও পুরুষ, এতদুভয়জাতি প্রায় সমান অংশে আছে। পুরুষ জাতি যত কেন বিদ্বান্, উন্নতরুচি, সমাজসংস্কারক হউন না, স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে কিছুতেই সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না, পুরুষ জাতির চিত্তও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে না। অশিক্ষিতা গৃহিণীরা কত সদনুষ্ঠানের পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয়, যে সকল লোকেরই মানসিক বৃত্তির উন্নতি ও অবনতি স্ত্রীলোকদিগের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ শৈশবাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, সন্তান জননীর চিত্তবৃত্তির অনুকারী হইবেই হইবে। বৃক্ষকে অপরিণত অবস্থায় যে দিকে নত করিবে, সেই দিকেই নত হইয়া থাকিবে। অনুকরণপ্রিয়তা মনুষ্য স্বভাবের একটী প্রধান গুণ, এবং বাল্যাবস্থায় প্রথম শিক্ষার মূল। যে বালক অহোরাত্র জননীর নিকটেই রহিয়াছে, সে যে জননীর দোষ গুণের অনুকরণ করিবে না ইহা একেবারে অসম্ভব। অদৃশ্য পথ দিয়া মাতার মনোবৃত্তি সরল শিশুর অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা একেবারে অধিকৃত করিয়া বসিবে। ঐ শিশু পরিণত বয়সে যদি দেবতুল্য চরিত্র হয়, তাহা হইলেও সেই চরিত্রের মধ্য দিয়া মাতৃ-চরিত্র উজ্জ্বলরূপে বিকসিত হইবে; জননীর চরিত্র অপেক্ষা সন্তানের চরিত্র সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা জননী চরিত্রের মার্জ্জিত অবস্থামাত্র। আর যদি শিশুর স্বভাব পশু অপেক্ষাও জঘন্য হয়, তাহাতেও জননীর দোষ অন্ততঃ অধিকতর কলুষিত হইয়া লক্ষিত হইবে। সন্তানের চরিত্র পিতা মাতার চরিত্র হইতে কোন কোন অংশে সম্পূর্ণরূপ বিপরীত বোধ হইলেও তাহাতে যে অনেকাংশে পিতা মাতার মনোবৃত্তি সকল নিহিত আছে, তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। এক একটী উদাহরণ একশত উপদেশ অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। বালককে সহস্রবার জননীর রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের উদাহরণ দেখিতে হয়। অতএব পুত্রের উন্নতির আশা করিবার অগ্রে আপনার অন্তঃকরণের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বীর

মাতা হওয়া ক্ষত্রিয়াণীগণের শ্লাঘার বিষয় হওয়াতেই ক্ষত্রিয়-তনয়গণের নিকট বীরত্বের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উপন্যাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ ওয়াল্টর স্কটের হৃদয় জননীর নিকট হইতে কবিত্বের আস্বাদ প্রাপ্ত হন। বীরবর নেপোলিয়ন কৈশোরে অত্যন্ত দুর্দ্দম ছিলেন, তিনি জননী ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করিতেন না। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, তাঁহার জননীর তেজঃ স্বভাবতঃ অপর স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক ছিল, সুতরাং নেপোলিয়নের তেজস্বিতা তাঁহারই অনুকারী বলিতে হইবে। এই প্রকারের উদাহরণ ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে অনেক পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতির শিক্ষার বিশেষ ফলের পরিচয় এইখানেই এক প্রকার দেওয়া হইল। স্ত্রীলোককে সংসারের সমস্ত দোষ ও গুণের আকরস্বরূপা বলিলেও বলা যায়, এবং স্ত্রীজাতির দোষ গুণের উপর সংসারের সমস্ত কর্ম্মফল নির্ভর করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার গুণে এই সমস্ত দোষ গুণের অনেক তারতম্য হয়, এমন কি যদি সংসারে সকল স্ত্রীই সচ্চরিত্রা, বুদ্ধিমতী, কার্য্যদক্ষা, ও পবিত্রহৃদয়া হন, তাহা হইলে আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষগণ ক্রমে এই সংসারেই স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন।

আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে দেখাইব, যে স্ত্রীর সহিত স্বামীর চরিত্রের কতদূর সাদৃশ্য সম্ভব। যদিও বাল্যকালে সকল ঘটনাই শিশুদিগের অনুকরণীয়, ও বাল্যকালের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি ঐ শিক্ষা স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে, তত্রাপি পরিণত বয়সেও মনুষ্য-স্বভাবের অনুকারিতা গুণ একেবারে লোপ পায় না। যদি সঙ্গদোষে পবিত্র হৃদয়ও কলুষিত হয়, এবং সদ্‌গুণে নরাধমও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে জীবনের চিরসঙ্গিনী স্ত্রীর চরিত্রের সহিত মনুষ্যের পূর্ব্ব চরিত্র মিলিত হইয়া তাহার যে একটী নূতন অবয়ব হইবে, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। পতি ও পত্নীর চিত্ত সমভাবাপন্ন না হইলে, উভয়ের মধ্যে কেহই সুখী হন না। সুতরাং এক জনের চিত্ত উন্নত করিতে গেলে, তৎসঙ্গে অপরেরও উন্নতি আবশ্যক এবং বাল্যাবধি উভয়ের শিক্ষা প্রায় সমানরূপ থাকিলেই সাংসারিক জীবনের উন্নতিও সমানরূপে হইতে পারে।

কেবল উল্লিখিত অভাবদ্বয় মোচন করাই যে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য তাহা নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যে স্ত্রী ও পুরুষ, এতদুভয়েরই বিদ্যা-

শিক্ষার সমান প্রয়োজন। যে যে কারণে পুরুষের বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক, সেই সেই কারণেই স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষাও প্রয়োজনীয়। বঙ্গীয় মহিলাগণ অবরোধবর্ত্তিনী বলিয়া, বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য (অর্থলাভে দাসত্ব) সাধন করিতে পারেন না, কিন্তু অপরাপর সমস্ত বিষয়েই বিদ্যা সমভাবে পূজ্য। প্রথমোক্ত দুইটী কারণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি সমভাবেই বর্ত্তে। সন্তান সন্ততির শিক্ষা, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নিকট হইতেই লব্ধ, এবং পরস্পরেরই অনুকরণীয়। বাল্মিকী, হোমর্, কালিদাস, সেক্সপীয়র, মিল্টন্, ভবভূতি, নিউটন্, ফ্রাঙ্কলিন, আর্য্যভট্ট, মিহির, শঙ্করাচার্য্য, সাংখ্য, কমৎ, হ্যামিল্টন্, প্রভৃতি লোক যে যে গুণে জগদ্বিখ্যাত, সেই সেই গুণ স্ত্রীজাতিরও অনায়ত্ত নহে। তবে গৌতম, ঈশা, লুথার, সক্রেটীস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ যতদূর বিখ্যাত হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে তত দূর হওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু একেকালে অসাধ্যও নহে। এতদ্ব্যতীত মানবহৃদয়ের যে সমস্ত সদ্‌গুণ সংসারকে মোহিত করিয়া থাকে, বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত ঐ সমস্ত গুণের চরমোন্নতি এক প্রকার অসম্ভব। যতগুলি লোককে দয়া, ধর্ম্ম, অহিংসা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমষ্টি দ্বারা বিভূষিত দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে বিদ্যাহীন কয়টী? যদিও উক্ত সদ্‌গুণ সমূহের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক বটে, কিন্তু উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া একাধারে অনেকগুলি গুণের সন্নিবেশ যথা নিয়মে শিক্ষিত লোক না হইলে হইতে পারে না। স্ত্রীপুরুষের মানসিক বৃত্তি সমতা প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইলে, দম্পতীর সুখের ইয়ত্তা থাকে না, এবং ইহাদের দ্বারা সংসারের অশেষবিধ উপকারের সম্ভাবনা। স্ত্রীর দয়ায় উত্তেজিত হইয়া পুরুষের বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় এক একটি পরিবার পৃথিবীতে এক এক কীর্ত্তি স্থাপন করে। যদিও আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা হইলে, পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সমান হইতে পারেন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে। আমরা এ সকল বিষয় ক্রমে বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

উপন্যাস-কুললক্ষ্মী।

(১৫৩ সংখ্যা ১৭ পৃষ্ঠার পর)

কুললক্ষ্মী কোথায়? পিতৃ মাতৃহীনা অনাথিনী লোকসমাজে তিরস্কৃতা বালিকা কোথায়? চল ভগিনি! সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্বশুরালয়ের বড় ঘরে যাইয়া দেখি, তবেই ধূলিধূসরিত কুললক্ষ্মীর দেহলতা ধরাতলে পতিত দেখিতে পাইব। দিনের পর দিন যাইতেছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতেছে, পক্ষের পর পক্ষ যাইতেছে, কুল-লক্ষ্মী সেই একটী রুদ্ধ গৃহেই পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছে—কখন কাঁদিতেছে, কখন ভাবিতেছে। হায়! সময়ে কি না করে! যে কুললক্ষ্মী কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একটু নির্জ্জনতার সুখ সম্ভোগের জন্য নিবিড় অরণ্যের আশ্রয় লইয়াছিল, আজ তাহারই পক্ষে নির্জ্জনতা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, একটু মনুষ্য কণ্ঠ শুনিতে, মনুষ্যের ছবি দেখিতে বাসনা হইতেছে। কিন্তু কোথায় মনুষ্য? একমাত্র কুললক্ষ্মীর বিমাতা রাত্রিতে যাইয়া তাঁহার গৃহে শয়ন করেন, দিবসে আহারীয় প্রদান্ করিয়া আসেন, অন্য লোকের তথায় যাইবার যো নাই। কুললক্ষ্মীর নিকট পড়িবার পুস্তক নাই, লিখিবার কাগজ কলম মসী কিছুই নাই, কথা বলিবার লোক নাই। কুললক্ষ্মী ভাবে আমার আর কেহ নাই, কেবল ঈশ্বর আছেন। তিনি আমার নিকটেই আছেন—না না আমাকে কোলে করিয়াই আছেন কেননা আমি বড় অনাথা, আমার আর কেহ নাই। ঈশ্বর তবে আমারই, যদি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরই আমার হইলেন, তবে আমার নাই কি? আবার ভাবে বিনোদ কোথায়? আমিই বা কোথায়? আর কি এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব, আর কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে? এ জন্মে কি আর তাঁহার মধুমাখা উপদেশ শুনিব না, আর কি এই দগ্ধ কর্ণে তাঁহার স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিব না, আর কি তিনি তেমন স্নেহময় কোমল দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া স্নেহের অশ্রু বর্ষণ করিবেন না! তবে আমি বাঁচিয়া আছি কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ, তাই বাঁচিয়া আছি। ছি পাপ করিব না, ঈশ্বরই আছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। কুললক্ষ্মীর এই অসীম দুঃখের আর ভাগী নাই। যদি বিনোদ বাবু দুঃখের ভাগী হন, তবু তিনি বিদেশে। এই মরুভূমিতে

কুললক্ষ্মীর দুঃখের সময় একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা অংশী হইতেছে, এই বালিকা আর কেউ নয় সেই হেমপ্রভা। হেমপ্রভা কেন যে কুলর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে, কেহ বুঝিতে পারে না। হেম সর্ব্বদাই কুললক্ষ্মীর বিমাতার নিকটে আসিয়া কুলর সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করে। ইহাতে আর কিছু ফল হউক না হউক, হেমপ্রভা প্রত্যুত্তরে যার পর নাই তিরস্কৃতা হয়, কিন্তু কুললক্ষ্মীর মনে সুখ দুঃখ উভয়ই ঝটিকাবৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। সুখ এই যে এই মরুভূমিতে একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছে, এই শ্মশানে একটী প্রাণীও তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু হেম নিতান্ত সরলা বালিকা, সে শুদ্ধ তাহার জন্যই তিরস্কৃতা হয় এই দুঃখ। হেমপ্রভা এক দিন প্রাতঃকালে কুললক্ষ্মীর ঘরের নিকট মলিন বদনে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় সহসা কুললক্ষ্মী বলিয়া উঠিল "হায়। হেমকে যদি দিনে একবার দেখিতে পাই, তবু আমি বাঁচিতে পারি।" আহা কুললক্ষ্মী তুমি কি বলিলে! হেম তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়াই কাঁদিতেছে, তুমি একবার চক্ষু তুলিয়া চাও, তবেই দ্বারের ফাটা দিয়া হেমকে দেখিতে পাইবে। হেম আর থাকিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, বলিতে লাগিল "দি দি! তুমি কি অভাগিনী হেমকে মনে কর? হেম যে তোমার বিমাতার ভয়ে চুপি চুপি তোমাকে দেখিয়া যায়, তুমি তা জাননা! আমি কি করে ঘরে আসিব? একবার মুখ তুলে দেখ দি দি! তোমার হেম তোমার দ্বারেতেই দাঁড়াইয়া আছে।" হেমপ্রভা বালিকাস্বভাব বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, কুললক্ষ্মীও আর সহ্য করিতে পারিল না "হেম একবার আমার বক্ষে আয়, আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি" এই বলিয় কুললক্ষ্মীও মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার সমস্ত লোক কান্না শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দুটী বালিকার পরস্পর ভালবাসা ও কান্না দেখিয়া সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ বলিতে লাগিলেন হেম কচি মেয়ে কুলর সঙ্গে দেখা করিবে তার আর কি? সর্ব্বেশ্বর স্ত্রী বলিলেন "জাননা যে দুষ্ট মেয়ে কি জানি কার চিঠী পত্র এনে দিয়ে সর্ব্বনাশ ঘটাবে।" এই রূপে একটা ভারী গোল হইতেছে, এমন সময় সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় কুললক্ষ্মীর বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই সমুদায় স্ত্রীলোককে শুভ কর্ম্মের উলুধ্বনি করিতে বলিলেন। তিনি হেমপ্রভার ও

কুললক্ষ্মীর কান্না শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহারা কাঁদিতেছে কেন? ক্রমে ক্রমে সমুদায় সমাগত স্ত্রীলোকগণ তাহাদের কান্নার কারণ বর্ণন করিলেন। কতজনে সর্ব্বেশ্বরকে মন্দ বলিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর মনে মনে বলিতে লাগিলেন না হবে কেন? কুলর জন্যত হেম কাঁদিবেই, তিনি হাসিয়া বলিলেন হেম তুমি কুললক্ষ্মীর সহিত স্বচ্ছন্দে সাক্ষাৎ কর, কিন্তু বই কাগজ কলম কি চিঠী পত্র কিছু আনিয়া দিতে পারিবে না। হেমপ্রভা বিপুলানন্দ সহকারে তাই স্বীকার করিল। কুললক্ষ্মী বিবাহের দিন ধার্য্য, এই সংবাদে প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা হইয়াছিল, কিন্তু এই ঘোর বিপদের সময় যে হেমপ্রভাকে দেখিতে পাইবে এই আনন্দে উৎসাহিত হইল। হেমপ্রভা অনুমতি প্রাপ্তি মাত্রে অমনি দৌড়িয়া যাইয়া কুললক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হইল এবং একেবারে কুললক্ষ্মীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বালিকার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুললক্ষ্মীও আর ভালবাসা গোপন করিতে পারিল না, এই অভাগিনী বালিকার প্রতি বিবিমতে স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কুললক্ষ্মী হেমকে একেবারে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার পানে চাহিতে লাগিল, অশ্রুজলে হেমের ক্ষুদ্র দেহলতা প্লাবিত হইতে লাগিল। দুটী বালিকা অনেকক্ষণ রোদন করিল ও অনেকক্ষণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিল। হেমপ্রভা বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "দি দি! আর ছাড়িব না আর ছাড়িব না, তোমাকে একা ফেলে আর যাব না, আমিও চিরদিন এই গৃহে রুদ্ধ থাকিব।"

পাঠিকা ভগিনি! কেন হেমপ্রভার কুললক্ষ্মীর প্রতি এত ভালবাসা তা সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা কর,—গোপনে জিজ্ঞাসা কর তবেই জানিতে পারিবে! যে কঠিন হস্ত কুললক্ষ্মীকে শৈশবে মাতৃকোল হইতে হরণ করিয়াছে, সেই কঠিন হস্তই এই অভাগিনী হেমপ্রভাকেও মাতৃকোল হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে!! কুললক্ষ্মীকে নিয়া পলায়ন করিবার ২। ৩ বৎসর পরে সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় গদাধর চক্রবর্ত্তী কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন, এই গমনের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে গ্রামের জমীদার ঘোষ বাবুদের বাড়ীর জন্য একটী পোষ্যপুত্র লইয়া আসা। সর্ব্বেশ্বর এক দিন কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছেন, দেখেন কালীবাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন বর্দ্ধমানের রাজমাতা কালী দর্শনে আগ-

করিয়াছেন, তিনি দীন দরিদ্র লোক ও ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিবেন। একটী প্রাঙ্গনে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র স্তূপাকার রহিয়াছে। সম্মুখে চারি জন রক্ষক এবং ১০। ১২ জন কর্ম্মচারী দানের কাপড় হস্তে উঠাইয়া দিতেছেন, রাজজননী বস্ত্র বিতরণ করিয়া দীন হীনগণকে মাঘ মাসের প্রবল শীতের হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছেন। অসংখ্য দরিদ্র কাঙ্গালি আসিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর দাঁড়াইয়া দান দেখিতেছেন। এমন সময় দেখেন একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোক একটী পীড়িত কন্যা কোলে করিয়া জ্বর ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজজননীর কৃপাদৃষ্টির প্রার্থিনী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বেশ্বর দেখিলেন সমুদায় ভিখারিণীদের মধ্যে এই স্ত্রীলোকটীতে প্রকৃত দুঃখ এবং দরিদ্রতার ছবি চিত্রিত রহিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর দুঃখিনীর প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ক্রমেই তাঁহার মন বিস্ময় সাগরে ডুবিতে লাগিল—তিনি মৃতবৎ নিস্পন্দ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুঃখিনীকে দেখিয়া রাজ-জননী এক খানা বস্ত্র ও তাহার কন্যার জন্য একটী সিকি প্রদান করিলেন। দুঃখিনী অন্যান্য কাঙ্গালির ন্যায় অনর্থক আর কিছুর প্রার্থনা না করিয়া রাজমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সেই দুঃখিনীটী এরূপ ব্যাধিক্ষীণা এবং ক্ষুধাতুরা যে অধিক দূর চলিতে পারিল না, একটুকু চলিয়াই একটী বৃক্ষ মূলে বসিয়া পড়িল। সর্ব্বেশ্বর তাহাকে ভালরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন, অতএব ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। দুঃখিনী সর্ব্বেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিল এবং অনিমেষ চাহিয়া থাকিয়া একেবারে সর্ব্বেশ্বরের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল "প্রভু! এক-বার বলুন,—এক বার দয়া করিয়া বলুন আমার সরলা কোথায়? আমি যদি শুনিতে পাই যে সরলা বাঁচিয়া আছে, তবে সুখে মরিতে পারিব।" সর্ব্বেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন "হাঁ কন্যাটী বাঁচিয়া আছে।" পরে তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে যে কন্যাটী ছিল সেইটীর পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার সেই গর্ভে কি এই কন্যা জন্মিয়াছে? দুঃখিনী বলিল "যখন আপনি সরলাকে নিয়া যান, তখন এটী গর্ভে ছিল।" সর্ব্বেশ্বর কর্কশ বাক্যে বলিল "তোমার এ দশা হইল কেন? হেম বাবু কোথায়? এখন আর তাঁহার গর্ব্ব কর না? বুঝি হেম বাবু তাড়াইয়া দিয়াছে।" দুঃখিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না হেম তাড়াইয়া দেয় নাই, সে বাঁচিয়া থাকিলে আমার কখনও এমন দশা হইত না। হেম মরি-

য়াছে—প্রভু! আমিও মরিব, আমি আর বাঁচিব না, কিন্তু হায় সরলাকে আর দেখিলাম না, আপনি তাহাকে দেখিবেন।” আর—অনশনে এবং দুর্ব্বলতায় দুঃখিনীর কণ্ঠরোধ হইতেছিল, বলিল আর এই অভাগিনী কন্যাটাকে আমি মরিলে নিয়া যাবেন, নচেৎ মরিবে।” সর্ব্বেশ্বর বলিল “সে যাহাহউক তুই কেন এই অবস্থায় স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার নাক কাটাইতেছিস্? এই কথা আর মুখে আনিয়া কাজ নাই, যে পর্য্যন্ত হইয়াছে সেই ভাল।” পরে সর্ব্বেশ্বর বলিল “তুমি, এখানে কেন? দুঃখিনী বলিল “আমি কন্যা শোকে আপনার বাড়ী অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এখন আর চলিতে পারি না; আমার আয়ু শেষ হইয়াছে, আপনি এক দিনের জন্যেও আমার পানিগ্রহণ করিয়াছেন, এক দিনের জন্য আমার কথা রাখুন; এক বার আমাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া যান, আমি সরলাকে দেখিয়া মহাসুখে আপনার চরণে পড়িয়া মরিব। কেহ জানিতে পারিবে না যে আমি আপনার স্ত্রী, আমি দাসীবৎ থাকিব—কিন্তু এই মেয়েটাকে যেন দাসীর মেয়ে বলিয়া লোকে ঘৃণা না করে।

সর্ব্বেশ্বর স্ত্রীর কথায় সংমত হইলেন এবং গদাধর চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রী ও কন্যার সহিত বাড়ী চলিলেন। পথে সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী আর চলিতে পারে না। সর্ব্বেশ্বর দেখেন স্ত্রী আর চলিতে পারে না, একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তখন উপায় ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া স্ত্রীকে এক পান্থশালায় ফেলিয়া কন্যা ও গদাধর চক্রবর্ত্তীর সমভিব্যাহারে বাড়ী চলিলেন!!! গদাধর বলিল যে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আপনি কন্যাটীর কি পরিচয় প্রদান করিবেন? কন্যাটী আমাকে দিন, আমি আপনাকে ২০০ শত টাকা দিব। সর্ব্বেশ্বর টাকার লোভেই হউক অথবা আপনার ঘোরতর কুকার্য্য গোপনের জন্যই হউক, গদাধরকে কন্যাটী প্রদান করিল! গদাধর সেই হইতে হেমপ্রভাকে আনিয়া আপন বাড়ীতে রাখিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কন্যাটীকে আপন ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবেন, কিন্তু ভ্রাতা দেশত্যাগী হওয়াতে হেমপ্রভা কুমারী অবস্থাতেই রহিয়াছে। পাঠিকাগণ এখন হেমপ্রভার পরিচয় পাইলেন, এবং কুললক্ষ্মীর সহিত তাহার সোদরা সম্বন্ধও বুঝিতে পারিলেন।

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য দর্পণ।

নৈমত্তিক কার্য্যপ্রণালী।

পুত্র কন্যাদির বিবাহ, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ, অথবা রোগীর সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদি কারণে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সেই সকলকে নৈমিত্তিক কার্য্য বলা যাইতে পারে, কেন না সে সকল কার্য্য নিত্য করিতে হয় না, কোন ঘটনা বশতঃ অর্থাৎ নিমিত্ত প্রযুক্ত উপস্থিত হইলেই সম্পাদন করিতে হয়। নৈমিত্তিক কার্য্য আনন্দসূচক হইলে আত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধবদিগেকে আহ্বান পূর্ব্বক ভোজন করান, তৎকার্য্যের প্রধান অংশ। এবিষয়ে গৃহস্বামী ও গৃহিণী উভয়েরই যত্ন ও সুনিয়ম রক্ষা দ্বারা কার্য্য সুসম্পাদিত হয় এবং তাহাদিগের দোষে অধিক ব্যয়েও সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সম্পাদিত হয় না। কোন কর্ম্মোপলক্ষে কেহ ২ অনেক লোককে নিমন্ত্রণ না করিলে পরিতৃপ্ত হন না, কিন্তু "অবস্থানুগতাচেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া" অবস্থা অনুসারে চেষ্টা এবং সময় অনুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম এ কথা মনে রাখিয়া সকল কার্য্যই করিতে হয়। যে কোন উপলক্ষেই হউক, বন্ধুবান্ধবদিগের নিমন্ত্রণ করা আমোদের বিষয়, কিন্তু অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া আমোদ করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। আপনার অবস্থা বিবেচনা করা অনেকের পক্ষে সহজ নহে, অপরের প্রশংসাবাদ ও স্বীয় আশাভিমানাদি দ্বারা আপনার অবস্থাবিষয়ক বিবেচনায় বুদ্ধির ভ্রান্তি হইয়া থাকে, এইটী স্মরণ রাখিয়া আপন অর্থ সঙ্গতি বিবেচনানুসারে ব্যয়-পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে নির্ব্বোধ লোকেরা নিন্দা করে ক্ষতি নাই, কেননা কষ্টে পতিত হইলে, তাহারা কেহই কষ্টভোগ করিবে না। যাহার কৃত কর্ম্ম, তাহারই ফলভোগ।

ব্যয়ের বিহিত পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া স্থানের বিষয় বিবেচনা করিতে হয়, কেননা প্রায় অনেকেই স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত অনেক লোককে আহ্বান করিয়া কষ্ট দিয়া থাকেন। "স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত মহাশয়দিগের কষ্ট হইতেছে, কিছু মনে করিবেন না" এরূপ কথা দ্বারা সুশীলতা প্রকাশ করা অপেক্ষা বাস্তবিক যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করাই শ্রেয়ঃ।

আহূত লোকদিগের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এমন যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনেকস্থলে গৃহস্বামী কার্য্যের নানা প্রকার প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকাতে আহূত ব্যক্তিদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারেন না, কিন্তু তাহাদিগের নিকট উপস্থিত থাকিয়া সম্ভাষণাদি করাই বিশেষ আবশ্যক ও তৃপ্তিজনক, তাহা করিতে কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় এমন বিবেচনা করিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

কার্য্যানুসারে সময়ের নিয়ম ও সহকারী লোকদিগের নিয়োগ করিবার নিয়ম পূর্ব্বে স্থির করিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পূর্ব্বে আহরণ করিতে হয়। নিত্য কার্য্যানুরোধে স্থান কাল লোক নিয়োগাদি বিষয়ে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, নৈমিত্তিক কার্য্যে সেই সকল নিয়মের প্রতি দৃঢ়তর রূপে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলেই তাহা সুসম্পাদিত হইতে পারে। যে কোন কার্য্যই হউক, তাহা সুসম্পাদিত করিতে হইলে তাহার নিয়ম স্থির করা ও তাহার তত্ত্বাবধান করাই বিশেষ প্রয়োজনীয়; অতএব বৃহৎ কার্য্যের স্থলে গৃহস্বামী বা গৃহিণী স্বয়ং কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়া সকল কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং আত্মীয় বা অনুগত লোকদিগের যোগ্যতা বুঝিয়া তাহাদের উপর কার্য্যের বিশেষ ২ ভাগের ভারার্পণ করিবেন। যত বৃহৎ ব্যাপারের কার্য্যই হউক, কার্য্যবিভাগ ও লোক নিয়োগ যথাযোগ্যরূপে করিতে পারিলেই তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। পুত্রকন্যার বিবাহ অথবা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম্মোপলক্ষেই সমারোহ অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু বন্ধু বান্ধবদিগের আহ্বানাদি কার্য্য শাস্ত্রবিধান বা ব্যবহারানুরোধে করিতে হয়, তাহার মধ্যে কিছুই কঠিন বা বৃহৎব্যাপার বলিয়া গণ্য নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন কথাই লিখিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু পরিবারস্থ কাহারও পীড়া উপস্থিত হইলে যে সকল নিত্যাতিরিক্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা অতিশয় যত্ন ও স্নেহ ব্যতীত সুসাধিত হয় না। রোগীর সেবা শুশ্রূষার ন্যায় যত্নের কার্য্য বোধহয় শিশুপালন ব্যতীত আর কিছুই নাই। রোগীর কখন কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্মোচনার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাবৎ কষ্ট ও রোগীর অবস্থা

স্মরণ রাখিয়া চিকিৎসককে সমুদায় বিষয় জানাইতে হয় এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ পথ্যাদি দিতে হয়। অতিশয় সহিষ্ণু ও নিরালস্য না হইলে এই কার্য্য যথাযোগ্যরূপে সম্পন্ন করা যায় না, এবং রোগীর নিকট নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করা আবশ্যক হইলে দুই তিন ব্যক্তিকে সময় ভাগ করিয়া রোগ—সেবার ভার লইতে হয়। এইরূপ কষ্টের সময় উপকার করাই আত্মীয় লোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

রোগীর সেবাশুশ্রূষা বিষয়ে যত্ন করিলেই যথেষ্ট হয় না, গৃহিণীদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। অনেক রোগ এমন আছে যে অকস্মাৎ প্রকাশ পায়, এবং আশু প্রতীকার করিতে হয়—এমন কি চিকিৎসককে সংবাদ দিতে ও তাঁহার উপস্থিত হইতে যে কালবিলম্ব হয়, তৎকাল মধ্যেই কোন প্রতীকার না করিয়া থাকা যায় না। অতএব গৃহিণীদিগের চিকিৎসা বিষয়ের জ্ঞান থাকিলে অনেক উপকার বোধ হয়। তদ্ভিন্ন শিশুদিগের রোগ হইলে তাহারা তাহাদিগের কষ্ট প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না বাহ্যলক্ষণ-দ্বারা তাহাদের রোগ অনুমান করিয়া লইতে হয়। চিকিৎসক অল্পক্ষণ মাত্র রোগীর নিকট থাকিয়া সমস্ত লক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না, সুতরাং শিশু-দিগের রোগ নির্ণয় করা কঠিন হইয়াপড়ে। এরূপস্থলে রোগের বাহ্যলক্ষণ বিষয়ে গৃহিণীর কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে তিনি চিকিৎসককে রোগ নির্ণয় বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন।

উপসংহার।

কোন ২ পুস্তক পাঠে আমোদ হয়, সে সকল পুস্তক অবকাশ মতে পড়িলেই যথেষ্ট। কোন ২ পুস্তক পাঠ দ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়, সে সকল পুস্তক মন স্থির করিয়া পড়িতে হয় ও চিন্তা করিয়া বুঝিতে হয়। কোন ২ পুস্তক পাঠে জ্ঞান লাভ হয়। সে সকল পুস্তক যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া হৃদয় ভাণ্ডারে জ্ঞানরূপ রত্ন সঞ্চয় করিতে হয়। কোন কোন পুস্তক পাঠ দ্বারা কার্য্যের নিয়ম শিক্ষা করা যায়, সে সকল পুস্তক যেমন পাঠ করিতে হয়, তেমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। গার্হস্থ্যদর্পণ খানি এই শেষ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সংসারের কার্য্য সকল ইহাতে প্রতিবিম্ব

রূপে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু সেইসকল কার্য্য অভ্যাস করাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, নতুবা শুদ্ধ গ্রন্থ পাঠ দ্বারা কোন ফলই লাভ হইবে না। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা পড়িয়া অনেকেই বলিবেন যে এ সকল কথা কে না জানে, এসকল কথা কি পড়িতে হয়, না শিখিতে হয়? বাস্তবিক তাহা সত্য, কিন্তু সে সকল কথানুসারে কার্য্য করাই উচিত। সামান্য দর্পণ দ্বারা কেশবিন্যাস করিতে যেরূপ সাহায্য পাওয়া যায়, গার্হস্থ্য-দর্পণ দ্বারা সাংসারিক কার্য্য করিতে সেইরূপ মাত্র সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন স্বীয় হস্ত সঞ্চালন দ্বারা কেশবিন্যাস করিতে হয়, তেমনি স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা সংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়।

প্রথমতঃ কর্ত্তব্য বিধান অর্থাৎ কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কি রূপে গুরুলোকের সেবা শুশ্রূষা করিবেক, কিরূপে পতিসেবা করিবেক, কিরূপে শিশুদিগের পালন করিবেক, কিরূপে অধীনস্থ ও আত্মীয় এবং কিরূপে অপর সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ করা আবশ্যক, এ সকল শুদ্ধ পাঠ করিলেই জানা যায় না। যখন যাহার প্রতি যেমন কর্ত্তব্য, তখন তাহার প্রতি তেমনি কার্য্য করিলেই সংসারের সকলের প্রীতিভাজন হওয়া যায়, সকলের সহিত সদ্ভাব থাকে, এবং সকলে মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যশৌচ—স্নান, পরিচ্ছদ, পরিশ্রম ও বিশ্রাম এবং আহার ইত্যাদি বিষয়ক নিয়মের জ্ঞান না থাকিলে গৃহিণী সংসারের সকলকে বিশেষতঃ শিশুদিগকে তত্তৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাইতে এবং স্বয়ং সে সকল নিয়ম পালন করিতে পারেন না, অতএব সেই সকল নিয়মের জ্ঞান লাভ হইলে তদনুসারে কার্য্য করাই বিশেষ আবশ্যক, নতুবা শুদ্ধ পুস্তক পাঠ দ্বারা কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল নিয়ম পালন করিলে সংসারের সকলে সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে যথাসময়ে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন।

তৃতীয়তঃ কি প্রকার স্থানে বাস করিবে, গৃহের কোন্ ২ স্থানে কি ২ দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া গৃহ সজ্জা করিবে, কিরূপে গৃহের সমুদয় অংশ ও সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী পরিষ্কার রাখিবে, সময়ের কিরূপ ও ব্যয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া

কার্য্য করিবে এবং কিরূপ নিয়মে আয়ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ লিখিয়া রাখিবে, এই সকল কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য না করিলে সুশৃঙ্খলে ও সুনিয়মে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। কার্য্য করাই কার্য্যের শিক্ষা, এবং কার্য্য করিতে ২ তদ্বিষয়ে বুদ্ধি যোগায়, এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া গৃহিণীরা গার্হস্থ্যদর্পণ ও এবম্বিধ পুস্তক পাঠ করিবেন।

চতুর্থতঃ নৈমিত্তিক কার্য্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদপেক্ষা অধিক লেখা বাহুল্য, কেননা কার্য্যমাত্রেরই সম্পাদনের একই প্রকার নিয়ম, অতএব কার্য্যের সাধারণ নিয়ম অবগত থাকিলে এবং কার্য্যের বিশেষ প্রকরণ অনুসারে নিয়মের তারতম্য করিয়া লইলেই তৎ-সম্পাদনার্থ সুপ্রণালী আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিত্য কার্য্য বিষয়েও যে সকল নিয়ম ও কার্য্য প্রণালী লিখিত হইয়াছে, তাহার এবং গৃহস্থের অবস্থা, পরিবারস্থ লোকসংখ্যা, গৃহের স্থান পরিমাণাদিরও নানা কারণ বশতঃ তারতম্য করিয়া লইতে হইবে।

সাংসারিক কার্য্য সুসম্পাদনার্থ গৃহিণীর যে সকল বিষয় জানা কর্ত্তব্য তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত বিষয়গুলি লিখিত হইল না। (১) পাক প্রকরণ-প্রথমতঃ। দেশীয় রন্ধন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের মতে অন্ন, পরমান্ন ব্যঞ্জনাদি সামান্য চলিত রন্ধন; দ্বিতীয়তঃ মোগল মতে মাংস রন্ধন; তৃতীয়তঃ মদকদিগের মতে ছানার ও নারিকেলের মিষ্টান্নের পাক, এবং পশ্চিমের হালুইকরদিগের মতে সুজি, ডাল কুমড়া ক্ষীর ইত্যাদি দ্রব্যের মিষ্টান্ন পাক; চতুর্থতঃ পশ্চিম নিবাসী দিগের মতে আচার ও মোরব্বা প্রস্তুত করিবার প্রণালী; পঞ্চমতঃ ইংরাজ-দিগের মতে কেক্, পুডিং বিসকুট পাঁমরুটী এবং দেশীয় সাধারণ মতে রুটী, লুচি, পুরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী। (২) দ্রব্যগুণ—প্রথমতঃ আহারীয় দ্রব্য সকলের গুণ, এবং কি রোগে কি পথ্য ও কি কুপথ্য, কোন্ ঋতুতে কি ফল মূলাদি উৎপন্ন হয় এবং কি ২ দ্রব্য ভোজনজনিত অজীর্ণতা হয় ও কি ২ দ্রব্য সেবনে তাহা আরাম হয়; দ্বিতীয়তঃ কি ২ দ্রব্য সংযোগে বা কি ২ প্রকরণ দ্বারা কি ২ বস্তু পরিষ্কৃত বা কি ২ প্রয়ো-জনীয় বস্তু প্রস্তুত করা যায়, যথা রেশমী বস্ত্র পরিস্কার করিবার প্রকরণ, ছারপোকা নষ্ট করিবার প্রকরণ ইত্যাদি; (৩) গৃহচিকিৎসা অর্থাৎ যে সকল রোগের আশু প্রতীকার করা আবশ্যক, সে সকল রোগ এবং

শিশুদিগের রোগ নির্ণয় করিবার লক্ষণ ও আরাম করিবার ঔষধ ও ব্যবস্থা।

উক্ত বিষয় গুলি যদিও গার্হস্থ্যদর্পণের অভিপ্রায়ানুসারে হওয়া অত্যাবশ্যক, কিন্তু স্বয়ং পাকক্রিয়া কুশল না হইয়া পাক প্রকরণের বিষয় লেখা, স্বয়ং চিকিৎসক না হইয়া গৃহচিকিৎসার ব্যবস্থা প্রদান করা অনধিকার চর্চ্চা; বিবেচনায় লেখক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইলেন। উক্ত বিষয় সকলে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারো দ্বারা যথোচিত রূপে লিখিত হইবে এই আশার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য-বিধান, স্বাস্থ্যবিধান, নিত্যকর্ম্ম প্রণালী ও নৈমিত্তিক কার্য্য প্রণালী এই চতুরঙ্গ-সম্পন্ন গার্হস্থ্যদর্পণ খানি গৃহিণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

সিংহল দেশীয় জলৌকা।

বর্ষাকালে এদেশে জলৌকা অথবা জোঁকের উপদ্রব সকলের বিদিত আছে। কিন্তু সিংহল দেশীয় জলৌকার উপদ্রব আরও ভয়ানক। ইহাদিগকে নিম্নভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ের উপর আর্দ্র ভূমিতে বন্য তৃণাদির মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য জলৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, যেখানকার ভূমি শুষ্ক, ইহাদিগকে কদাচ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ের উপর যে স্থানে ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জন্মে, সে স্থান উত্তাপে শুকাইয়া গেলে ইহাদিগের একটীকেও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একবার মাত্র বৃষ্টিপাত হইলেই পুনরায় সহস্র সহস্র জলৌকা দেখা দেয়। ইহারা মরিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, কি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে নূতন জলৌকার উৎপত্তি হয়, এপর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছুই স্থির হয় নাই।

ইহারা আর্দ্র ভূমিতে জন্মে বটে, কিন্তু পুষ্করিণী, নদী অথবা অন্য কোন রূপ জলাশয়ে থাকে না। ইহারা ভূচর জীব। ইহারা প্রায় এক বুরুল লম্বা হইয়া থাকে এবং সামান্য সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম হয়। রক্ত শোষণ করিলে ইহাদিগের শরীর হংস পুচ্ছের ন্যায় স্থূল হইয়া উঠে। ইহারা আপনাদিগের শরীর এরূপে আকুঞ্চন করিতে পারে যে বস্ত্রের মধ্যে থাকিলে ইহাদিগকে সূক্ষ্ম

বলিয়া ভ্রম হয় এবং এইরূপে অলক্ষিত ভাবে মানুষের গাত্রের উপর উঠিয়া পৃষ্ঠ অথবা গলদেশের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। সিংহলের কাফি-কর বর্গ ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পদদেশ এক প্রকার মোটা এবং ঘন বুনান কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। সেই দেশবাসী ইতর লোকে গাত্রে তৈল, তামাকু-ভস্ম অথবা লেবুর রস মাখিয়া থাকে। লেবুর রসে জলোকাকৃত ক্ষত হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং শীঘ্র২ ক্ষতের মুখ শুকাইয়া যায়।

জলোকাগণ শরীরের এক প্রান্ত ভূমি-সংলগ্ন করিয়া ঠিক্ সোজা হইয়া আপন শিকারের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা এরূপ সতর্ক যে, মনুষ্য অথবা অশ্ব নিকটে গেলেই দ্রুতবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসে। ইহারা আপন শরীরের উভয় প্রান্ত ভূমি সংলগ্ন করিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকারে চলে। ইহারা এত ক্ষুদ্র এবং এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র করে, যে যখন প্রথম রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না। যখন শরীরহইতে রক্ত নির্গত হয় এবং যখন ইহারা রক্ত খাইয়া স্থূল হইয়া ঝুলিতে থাকে, তখনি স্পষ্ট অনুভূত হয়। ইহারা অশ্বদিগকে পাগল করিয়া তুলে, ইহাদিগকে ঝাড়িয়া ফেলিবার নিমিত্ত তাহারা মুহুর্মুহুঃ ভূমে পদাঘাত করে এবং ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়। ইতর লোক এবং পালকিবাহকদিগের অনাচ্ছাদিত পদদেশ ইহাদিগের একটী সুন্দর আক্রমণ স্থল। ইহারা পক্ক পলগুচ্ছের ন্যায় পদের গ্রন্থিতে ঝুলিতে থাকে। ইহাদিগের কৃত ক্ষত হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়। দষ্ট ব্যক্তি যদি সুস্থ ও সবলকায় হয়, এবং ক্ষত দেশ যদি উদ্বেজিত না হয়, তবে সামান্যরূপ ফুলিয়া ও বেদনা হইয়া সারিয়া যায়। কিন্তু দুর্ব্বলকায় এবং অসুস্থ ব্যক্তিদিগকে কামড়াইলে ও ক্ষত স্থান চুলকাইলে ঘা হইয়া বিষম হইয়া উঠে। তখন অঙ্গ হানি এমন কি প্রাণ নাশ পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। ১৮১৮ অব্দে বহুসংখ্যক মান্দ্রাজি সিপাহি, কুলি এবং পেয়াদা এই জলোকাকৃত ক্ষতে প্রাণ হারায়।

এই জলোকাগণ রক্তের সন্ধান পাইলে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং যাত্রিদিগের মধ্যে যাহারা সকলের পশ্চাতে পড়ে, তাহাদিগকে অধিক উৎপাত সহ্য করিতে হয়।

এই বিশ্ব সংসারে যে কত অদ্ভুত জীব আছে তাহা কে বলিতে পারে?

চন্দ্রলোক।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। চন্দ্র দেখিতে এত সুন্দর, অতএব ইহা অবশ্যই অতীব প্রীতিকর স্থান হইবে, সকলের এইরূপ বোধ হয়। কবির কল্পনা ইহাকে পুণ্যাত্মাদিগের নিবাস স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাহা কিছু মনোহর সমুদায়ই চন্দ্রলোকে পাওয়া যায়, এইরূপ সকলের বিশ্বাস। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান বলে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে; চন্দ্রলোকে যাইতে আর আমাদিগের সাধ নাই। পণ্ডিতেরা চন্দ্র সম্বন্ধে কি বলেন পাঠিকাবর্গকে তাহার মর্ম্ম বলিতেছি।

প্রথমতঃ—চন্দ্রলোক অত্যন্ত পর্ব্বতময়, ইহার উপরিভাগ কেবল নিম্নোন্নত ভূমিভাগে পরিপূর্ণ। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হইয়া চন্দ্র আলোকিত হয় এবং তাহাই প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আইসে; সুতরাং চন্দ্রের যে যে ভাগে সূর্য্যালোক বিশিষ্টরূপে পতিত হয়, তাহা আমরাও সাতিশয় উজ্জ্বল দেখিতে পাই এবং যে যে ভাগে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পায় না সেই সেই স্থান অন্ধকারময় দেখা যায়। আমরা যে চন্দ্র মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাই, সে কেবল এই কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্রলোকের যে যে স্থান কৃষ্ণবর্ণ সেই ২ স্থান গভীর এবং তন্মধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পায় না; যে যে ভাগ বিশিষ্টরূপে উজ্জ্বল তাহা পর্ব্বতময়। পাঠিকাবর্গ কলঙ্কই বলুন, আর বুড়ী চর্‌কা কাটিতেছে বলুন অথবা চন্দ্র খরগোষ কোলে করিয়া আছে যাই বলুন, পণ্ডিতেরা চন্দ্রমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সমুদায়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন!

দ্বিতীয়তঃ—চন্দ্রলোকে বায়ু নাই; এক স্তর বায়ুরাশি যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, চন্দ্রে সেরূপ নাই। যদি থাকে ত তাহা এত তরল ও লঘু যে পৃথিবীস্থ কোন জীব তাহাতে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। চন্দ্রের চতুর্দ্দিক যে বায়ু বেষ্টিত নহে, পণ্ডিতেরা তাহার কয়েকটী কারণ দেখাইয়াছেন।

(ক) বায়ুর গুণ এই যে ইহা আলোকের জ্যোতিঃ হ্রাস করে, অর্থাৎ আলোক বায়ু-ভেদ করিয়া আসিলে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইয়া থাকে; অতএব চন্দ্রে বায়ু থাকিলে,

যখন কোন নক্ষত্র ইহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট* হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ চন্দ্রোপরিস্থ-বায়ুরাশির পশ্চাতে পড়াতে তাহার জ্যোতিঃ হ্রাস হইবে, পরে চন্দ্রের পশ্চাতে পড়িলে একবারে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কোন নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হ্রাস হয় না, চন্দ্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে সে একবারেই অন্তর্হিত হয় ইহাতে বোধ হইতেছে চন্দ্রে বায়ু নাই।

(খ) চন্দ্রে অন্তঃপ্রবেশ হেতু কোন নক্ষত্র যতক্ষণ অদৃশ্য হইয়া থাকে, বায়ু থাকিলে তদপেক্ষা অল্পক্ষণ অদৃশ্য থাকিত; কারণ নক্ষত্র অদৃশ্য হইবার পর ও পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বে তাহার রশ্মি সমুদায় বায়ুতে প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইত*।

(গ) সূর্য্য রশ্মি বায়ুতে প্রতিফলিত হওয়াতে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ও অস্তের পরে একবারে অন্ধকার হয় না, পরন্তু অল্প অল্প সন্ধ্যালোক থাকে। চন্দ্রেও সেইরূপ। যদি চন্দ্রে বায়ু থাকিত, তাহা হইলে (এই প্রতিফলন জন্য) ইহার আলোকিত ভাগের পার্শ্বদেশে অল্পালোকিত ভাগ থাকিত, সুতরাং আমরা চন্দ্রকলার পার্শ্বদেশে অপেক্ষাকৃত অল্পালোকবিশিষ্ট অন্য আর এক কলা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না; অতএব চন্দ্রে বায়ু নাই।

তৃতীয়তঃ—চন্দ্র আমাদিগের দুই পক্ষে ২৯৷০ দিনে, আপনার কেন্দ্রে একবার আবর্ত্তন করে; এবং পাঠিকাবর্গ জানেন যে গ্রহ উপগ্রহগণের আবর্ত্তনেই তাহাতে দিবারাত্রি হইয়া থাকে, অতএব চন্দ্রের দিবা এক পক্ষ ও রাত্রি এক পক্ষ। এক পক্ষকাল ব্যাপিয়া সূর্য্য ক্রমাগত আকাশের উপরে বিচরণ করে, এবং অন্য এক পক্ষ সূর্য্য দেখা যায় না। ক্রমাগত এক পক্ষ সূর্য্য আকাশের উপরে থাকাতে এত উত্তাপ হয় যে মনুষ্যশরীর তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যায়,

* যাঁহারা চন্দ্রোদয় লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে অমাবস্যার পর চন্দ্র আকাশের পশ্চিমে দেখা দেন, এবং প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে গগণের পূর্ব্বভাগে সরিয়া আইসেন, কিন্তু তারকামণ্ডলীর এরূপ গতি নাই; সুতরাং চন্দ্র যখন সরিয়া আসিতে থাকেন, তখন কোন না কোন নক্ষত্রকে অতিক্রম করিয়া আইসেন; আবার নক্ষত্রগণের দূরতা চন্দ্র অপেক্ষা অধিক সুতরাং যখন চন্দ্র কোন নক্ষত্রকে অতিক্রম করেন, তখন নক্ষত্র চন্দ্রের পশ্চাতে ঢাকিয়া পড়ে; নক্ষত্রগণের এইরূপ চন্দ্রান্তরালে আবৃত হওয়াকেই চন্দ্রে অন্তঃপ্রবেশ বলে।

ক্রমাগত একপক্ষ কাল সূর্য্য অদৃশ্য থাকাতে ভূমি অসম্ভব শীতল হয়। সে শীত আমাদিগের কেন্দ্র সন্নিকটস্থ ভূভাগের অপেক্ষা ২৫,৩০ গুণ অধিক।

চতুর্থতঃ—চন্দ্র দুই পক্ষে আপনার কক্ষে থাকিয়া পৃথিবীকে একবার বেষ্টন করিয়া আইসে; সুতরাং চন্দ্রের বৎসর আমাদিগের দুই পক্ষ এবং তাহাই চন্দ্রের এক দিন। অতএব চন্দ্রের ঋতু পরিবর্ত্ত ইহার এক দিনে সংঘটিত হইয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ—চন্দ্রে জল নাই; জল থাকিলে মেঘের উদয় হইত এবং তাহা হইলে নক্ষত্রগণ চন্দ্রে অনুপ্রবেশের পূর্ব্বেই কখন কখন অদৃশ্য হইত। আর যদিই জল থাকে, তাহা হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রে দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তাপ সুতরাং সমুদায় জল বাষ্প হইয়া যায় এবং রাত্রিতে অত্যন্ত শীত সুতরাং তখন সমুদায় জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সুতরাং চন্দ্রে কোন প্রকারেই জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে চন্দ্রমণ্ডলের প্রকৃতি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা মনুষ্যগণের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি, ইহাতে পৃথিবীর জীবগণ হইতে ভিন্নপ্রকৃতির জীব থাকিতে পারে। তাহারা হয়ত নিম্নোন্নত পর্ব্বতভূমিতে শীতোত্তাপ সহ্য করিয়াও বাস করিতে পারে এবং জলাভাবেও বাঁচিতে পারে।

নূতন সংবাদ

১। আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনারল লর্ড লিটন সম্প্রতি আপনার কোমলতা ও দয়াশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক অভিপ্রায় পত্র লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবাসী ভৃত্যদিগকে ইংরাজেরা ঘুঁষি মারিয়া হত্যা করিয়া থাকেন, অতএব অতঃপর যে কোন ইংরাজ ভৃত্যকে ঘুঁষি মারিবেন, তাঁহাকে দণ্ড বিধি আইনের অধীনস্থ হইয়া শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যে ঘটনায় এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় তাহা এই;—আগ্রার ফুলার নামে এক উকীল সস্ত্রীক গির্জ্জায় যাইবার সময় কাটাক্স নামক সইসকে দেখিতে পান নাই। তাহাকে ডাকিলে সে আসিল। তখন সাহেব তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়া মৃতবৎ ফেলিয়া গির্জ্জায় চলিয়া যান। অল্পক্ষণ পরে লোকটী মরিয়া যায়। আগ্রার ম্যাজিষ্ট্রেট এই নরহত্যার জন্য ফুলারকে কেবল ৩০ টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেন।

গবর্নর জেনারল এইরূপ অবিবেচনার জন্য হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিম গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করেন এবং মাজিস্ট্রেট ১২ মাসের মধ্যে উৎকৃষ্টতর বিচার শক্তির পরিচয় না দিলে স্বাধীন কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইবেন না এই আদেশ করেন। গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের এই সদাশয়তার জন্য ইংরাজ মহল অত্যন্ত ক্ষেপিয়াছেন, কিন্তু সমুদায় ভারতবাসী তাঁহাকে কোটী২ স্বরে ধন্যবাদ করিতেছেন।

২। বিবী গারেট আণ্ডারসন এম ডি চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা ব্যবসায়ে পুরুষদিগকে পরাস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া পুরুষ ডাক্তারগণ ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন।

৩। একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার হইতে ২ লক্ষ পর্য্যন্ত। আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গণনায় শরীরের লোম সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩।। কোটী, তাঁহারা মস্তকের কেশের কি সংখ্যা করেন নাই?

৪। অওনে স্ত্রীলোকদিগের খৃষ্টান টেম্পারেন্স সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ সভ্য স্ত্রীলোক। ঐ নারীগণ শুরায়লনী নামে বিখ্যাত হউন।

বামাগণের রচনা।

সেই এক দিন।

সেই এক দিন। হতেছে স্মরণ;
যে দিনেতে হায়, সকল ফুরায়,
কিছুই বলিতে থাকেনা আপন।
থাক্‌না কেমনে হয়, হস্তী সব,
কিম্বা ধন জন, থাক্ অগনন,
স্বর্ণ-সিংহাসন বিপুল বিভব।
থাক্ রাজ্য হোক্ উপাধি-ভূপতি।
মণিময় হার, অক্ষয় ভাণ্ডার,
থাক্ হীরা চুণি, বহুবিধ মতি।

থাকুক্রে যতেক বন্ধু পরিজন।
সেই দিনে হায় কে হবে সহায়,
যে দিনে ধরিবে দুরন্ত শমন।
থাকুন্ জনক, অথবা জননী,
থাক্‌রে সোদর, থাক্‌রে ভগিনী,
রাখিবে কি তারা বল ২ শুনি?
জনমের মত যাইছে যে জন,
আর কি তাহারে, ফিরাইতে পারে,
করিয়া যতন, অথবা বারণ?
তবে রে কি হবে সে দিন ভাব না,
যাইবে যে দিনে, শমন ভবনে,
সে দিনের দিন মনেতে কর্‌রোনা।
হইলে সে দিন উদয় হৃদিতে।
ধরেনা আগার, আনন্দ অপার,
একাননে তাহা পারিনা বলিতে।
সে সুখের দিন উপমা রহিত
কিন্তুরে আবার, ভাবি পুনর্ব্বার,
যাইব কি নিয়ে কাহার সহিত?
আমি রে পাপিনী বঞ্চিতা ধর্ম্মেতে,
কার ভরসায়, হইব নির্ভয়,
অমূল্য রতনে পারিনা চিনিতে।
দেখিতেছি যাহা, কিছু স্থায়ী নয়,
তথাপি ত মন, না হয় চেতন?
অচেতন হয়ে সদাই রয়।
ওহে জ্ঞানাধার অজ্ঞান আমার,
নাশিয়া সকল, করহে নির্ম্মল;
তোমার করুণা অসীম অপার।

হরিমতি। কালনা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

সন ১২৮২ সাল।

ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস উনাউ ১।/০
শশীভূষণ দত্ত মুসলমান পাড়া ২।০
বসন্তকুমারী মিত্র বর্দ্ধমান ১।/০
দুর্গাপ্রসন্ন দাস কালীয়া ২॥৵০
হেমচন্দ্র সিংহ লক্ষ্ণৌ ১২।৵০ মধ্যে ২৬০
রাজকুমার রায় ঢাকা ২॥৵০
মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাশীপুর ২॥৵০
বনমালী চট্টোপাধ্যায় দানাপুর ১৵০
ব্রজেন্দ্রকুমার রায় হেয়ার স্কুল ২।০
দীনেশচন্দ্র বসু জাফর গঞ্জ ২॥৵০
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়পাতিয়ালা
৮১ সমেত ৩্
চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী সন্ন্যাসীকাটা ২॥৵০
দুর্গাপ্রসাদ মুখো গোরক্ষপুর ২॥৵০
বিশ্বেশ্বর সেন ঢাকা ২॥৵০
মতিলাল ঘোষ বৌবাজার ১৵০
যদুনাথ বসু আগ্রা ২॥৵০
কুসুমকুমারী দেবী শান্তিপুর ২॥৵০
কৃষ্ণচন্দ্র পাল বেরিলী ১।/০
দুলালচন্দ্র দে শ্রীহট্ট ২॥৵০
মুক্তাকিশোরী চৌধুরী
গোয়াতলী ২৵০ মধ্যে ॥০
গোপীকৃষ্ণ সেন ময়মনসিংহ ২॥৵০
হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উনাউ ১।/০
মহম্মদ নবি নসিরগঞ্জ ৩৸৵০ মধ্যে ২্
হরনাথ ভট্টাচার্য্য কটক(৮১সালসমেত)১
পার্ব্বতীচরণ রায়ফরিদপুর ৮০।৮১
সমেত ৬্
রামপ্রসাদ সেন ঢাকা ২৸৵০ মধ্যে ২॥৵০
ক্ষেত্রমোহন সেন শ্রীরামপুর ২॥/১০
হরিশ্চন্দ্র স্বোয়ার বারাণসী ২॥৵০
হরকামিনী দেবী মূলফৎগঞ্জ ২॥৵০
গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় রাঞ্চি ২॥৵০
লক্ষ্মীনারায়ণ রায় বর্দ্ধমান ১।/০
শ্রীনাথ রায় লক্ষ্মী ২॥৵০
শ্রীকৃষ্ণ হাজরা শিয়ালদহ ১৵০
অমৃতলাল পাল শ্যামবাজার ২।০
সীতানাথ দত্ত নিকেতন ১॥০
ভূজঙ্গভূষণ রায় পটলডাঙ্গা ২।০
বিন্ধ্যবাসিনী দাসী ময়মনসিংহ ২॥৵০
শ্রীনাথ চন্দ্র ঐ ১।/০
নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ ২॥৵০
রাধিকানাথ চট্টো আম্বুলিয়া ২।৵০
নিবারণচন্দ্র পাল চেতলা ১৬০ মধ্যে ১্
উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ভবানীপুর ২।০
হারাণচন্দ্র মুখো আলিপুর ২।০ মধ্যে ১্
গঙ্গাহর দাস বাগবাজার ১৵০
বিশ্বনাথ সিংহ লক্ষ্ণৌ ২॥৵০
রামদাস বসু কাচড়াপাড়া ১।/০
অন্নপূর্ণাদেবী মাথাভাঙ্গা ২॥৵০
জগদ্বন্ধু দে বকসার ৫॥০ মধ্যে ৫্
কিশোরীমোহন সেন গাজীপুর ২॥৵০
কালীমোহন মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ ১।/০

ভুবনময়ী দাসী রঙ্গপুর ২॥৵০
মহালক্ষ্মী ঘোষ এলাহাবাদ ৬৵০
কেদারনাথ কুলভি বাঁকুড়া
৮১। সমেত ৩৶৵০
কাদম্বিনী ও স্বর্ণময়ী সূত্রপুর ২॥৵০
শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জামতারা ৪৵মধ্যে ২৲
রামেশ্বর দাস রাঞ্চি ।৵০
গোপালচন্দ্র মুখো লক্ষ্ণৌ ২॥৵০
যোগেন্দ্রনাথ সরকার টাকি ॥৶০
হরিমতি চট্টো কালনা ১॥৵০
কুমুদকামিনী মুখো গোঠপাড়া ২॥৵০
রাধাশ্যাম গুঁই বড়বাজার ১৲
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ঠনঠনিয়া ১৵০
ছত্রধর ঘোষ পটলডাঙ্গা ১৵০
গুরুচরণ দাস ভবানীপুর ২।০
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তালতলা ১৲
বৈকুণ্ঠনাথ সেন যোড়াসাঁকো ১৲
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী বাগবাজার ১॥০
অনুপচন্দ্র মুখো জনাই ৮০।৮১সমেত ৬৲
ঈশানচন্দ্র বসু গয়া ১I/০
ব্রজেন্দ্রকুমার মুখো হালিসহর ৮০।৮১
সমেত ৬৲
রমানাথ চট্টো লক্ষ্ণৌ ১২॥৵০ মধ্যে ১০৲
অবিনাশচন্দ্র চন্দ্যোপাধ্যায় আগরা ১৲
যোগমায়া চক্রবর্ত্তী বৈটকখানা ১৵০
সাধুচরণ দে চুনাপুকুর ॥০
হেরম্বনাথ দেব শিয়ালদহ ৮১ সালের ২।০
বামাসুন্দরী দত্ত কোচবিহার ২॥৵০
মনোহরা দাসীরা বহুহুহিতা ঢাকা ২॥৵০

১২৮৩ সাল।

গৌরিবল্লভ সেন বৈদ্যপুর ২॥৵০
তারাসুন্দরী ঘোষ ভেওড়া ২॥৵০
বেণীমাধব মিত্র গোয়ালন্দ ২॥৵০
শিবচন্দ্র দেব কোননগর ২।০
বনমালী চট্টোপাধ্যায় দানাপুর ১॥০
চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী সন্ন্যাসী কাটা ২I/০
মহারাণী স্বর্ণময়ী কাসিমবাজার ২॥৵০
দুর্গাপ্রসাদ মুখো গোরক্ষপুর ২॥৵০
ব্রজেন্দ্রকুমার বসু ফুরা ২॥৵০
কালীশঙ্কর কবিরাজ সদ্যপুষ্করিণী ২॥৵০
পাঁচদোনা বালিকা বিদ্যালয় ঢাকা ১I/০
হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উনাউ ১I/০
হরিশ্চন্দ্র স্বোয়ার বারাণসী ২।৵০
হরকামিনী দেবী মুলফত্র গঞ্জ ২।৶০
লক্ষ্মীনারায়ণ রায় বর্দ্ধমান ১I/০
শ্রীনাথ রায় লক্ষ্মী ২॥৶০
মদনমোহন মিত্র সিমলা ।০
গোপীকৃষ্ণ সেন ময়মনসিংহ ২॥৶০
অম্বিকাচরণ আদিত্য এলাহাবাদ ২॥৶০
তিনকড়ী ঘোষ সিমলা ১৶০
রাধিকানাথ চট্টোপাধ্যায় আন্দুলিয়া ॥৵০
মহেন্দ্রনাথ মিত্র লক্ষ্ণৌ ২॥৶০
কৃষ্ণকান্ত সাহা বোয়ালিয়া ২॥৶০
রামদাস বসু কাচড়াপাড়া ১I/০
জগদ্বন্ধু সান্যাল ফাইজাবাদ ২।৶০
অন্নপূর্ণাদেবী মাথাভাঙ্গা ২।৶০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৫৬ সংখ্যা । শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৮৩। । ১২ শ ভাগ

নীতি-সূত্র।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

যিনি সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখেন, তিনিই পণ্ডিত।

এই বচন দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে আপনার প্রতি সকলেরই স্বভাবতঃ যত্ন আছে। আপনার ক্ষুৎপিপাসা শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অনুভব দ্বারা আমরা স্বভাবতঃ কি কি বস্তু প্রিয় ও গ্রাহ্য এবং কি কি বস্তু অপ্রিয় ও ত্যাজ্য তাহা জানিতে পারি। অতি শৈশবকালে আমরা স্বভাবতঃই এ বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকি, এবং মাতা পিতাদি সেই শিক্ষা প্রদানে সহকারী হইয়া থাকেন। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি হইলে সেই শিক্ষার অভিপ্রায় যত বুঝিতে পারা যায়, ততই আমাদিগের শরীর রক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সৌভাগ্যশালী হইবার চেষ্টা আরব্ধ হয়। কিন্তু সৌভাগ্য-শালী হইলে শুদ্ধ উক্ত অভিপ্রায় সাধনে আমরা সক্ষম হই এমন নহে, তদ্দ্বারা আমরা লোকসমাজে সকলের সম্মান ও বিশ্বাসভাজনও হইতে পারি। অতএব আপনার শরীর সুস্থ থাকিবে, অক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে, লোক সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে ইহা সকলেরই প্রথম চেষ্টা। এই আত্ম হিতানুরাগ ধর্ম্মের উপদেশে পরোপকার ব্রতে রত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ,

শাস্ত্রবিহিত ও নীতি-সঙ্গত ; অতএব সকল জীবকে কিরূপভাবে দেখিবে, তাহা মীমাংসা করিতে হইলে আত্ম-হিতানুরাগ-সঙ্গত আচার ব্যবহারাদি পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

দুর্ভাগ্যের পর সৌভাগ্যোদয় হইলে যে পরিমাণে সুখ, সৌভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য ঘটিলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দুঃখ হয়। অতএব যাহাতে অবস্থার হীনতা না হয়, তাহাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বা আত্মহিতানুরাগীর প্রথম চেষ্টা। শারীরিক স্বাস্থ্য,ধন বা সম্মান ইত্যাদি বিষয়ের হানিজনক ব্যাপার হইতে তিনি সাবধানে নিবৃত্ত থাকেন ; তিনি স্বকীয় কার্য্যে পরিশ্রম ও কৌশল প্রয়োগ দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে যত্নবান্ হয়েন, কিন্তু অনিশ্চিত বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না,কেন না অনিশ্চিত লাভের প্রত্যাশায় হস্তগত সম্পত্তি বিসর্জ্জন করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। কোন বিষয় বুদ্ধিগম্য না হইলে তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি লোককে প্রতারণা করেন না, নিজের গুণ বিস্তীর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া লোকের মনে আশ্চর্য্য জন্মাইবার ইচ্ছা করেন না এবং চাতুরী বা কৌশল দ্বারা মহৎ লোকের কটাক্ষপাতের প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহার গুণ কখন তাঁহার নিজ মুখে প্রকাশ পায় না, কার্য্যেতেই দেখা যায়। তিনি মিথ্যাকে ভয় করেন এবং সদা সত্যবাদী হয়েন, তিনি অসত্য কথা ব্যবহার করেন না, কিন্তু আবশ্যক না হইলে সকল কথা ব্যক্ত করাও বিবেচিত মনে করেন না। তিনি কার্য্যেতেও যেরূপ, কথাবার্ত্তাতেও সেইরূপ সাবধান থাকেন। তিনি কখন চাঞ্চল্য বা বাচালতা প্রকাশ করেন না। তিনি শিষ্টাচারী হন এবং কোন বিষয়ে আপনার প্রাধান্য কদাপি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন না, বরং আপনার গুণ সকল অপ্রকাশিত রাখিতে ইচ্ছা করেন। তিনি সকলের সহিত সদ্ভাব রাখেন, কিন্তু বন্ধুতা বিষয়ে অতি সাবধান থাকেন, যে কোন ব্যক্তিকেই বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন না। ধীর সচ্চরিত্র প্রকৃত প্রেমানুরক্ত কোন ব্যক্তির সহিত ঘটনাবশতঃ মিলন হইলে পরস্পরের অন্তঃকরণের ভাব ও ব্যবহারের সমতা হেতু যে আন্তরিক সৌহৃদ্য জন্মে, সেই সৌহৃদ্যকেই যথার্থ বন্ধুতা বলিয়া মানেন এবং সেই সুহৃদের সহিত পরামর্শ ও মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করেন, উপস্থিত সুখ সম্ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবী সুখাশায় কখন নিশ্চেষ্ট থাকেন না; বরং অগ্রে পরিশ্রম পরে বিশ্রাম, অগ্রে কষ্ট পরে সুখ, ইহাই

পরস্পরের টানাটানিতে এক প্রকার চলিতেই হইবে। পরস্পরের বিরোধদ্বারা একটী সুনীতি স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। উপমাদ্বারা এই বিষয়টি বিলক্ষণ বোধগম্য হইতে পারে। একটি ভৌতিক বস্তুর আকর্ষণ শক্তিদ্বারা ইহার পরমাণুসমুহ ও অন্যান্য ভৌতিক পদার্থসমূহ ইহার কেন্দ্রভাগে আকর্ষিত হয়, অপর ভৌতিক বস্তু সকলের প্রত্যেকেরও সেইরূপ আকর্ষণ শক্তি আছে, সুতরাং পরস্পরের আকর্ষণ শক্তির সামঞ্জস্য হইয়া একটি অচিন্ত্য সুনিয়মে ভৌতিক পদার্থসমূহের কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিদ্বারা ইহার উপরিস্থ সমস্ত বস্তু ইহাতে আকৃষ্ট হয়। সেই শক্তির প্রভাবে চন্দ্র ইহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান থাকে, এবং সেইরূপ শক্তির প্রভাবে ইহা স্বয়ং চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হয় এবং সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদিগের আকর্ষণশক্তির সামঞ্জস্য হইয়া এক চমৎকার অনির্ব্বচনীয় নিয়মে সৌরজগতের কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। পুনরায় এই সৌর জগতের সহিত অন্যান্য সৌর জগতের—এবম্প্রকার পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ থাকাতে সমস্ত বিশ্ব সংসারের ভৌতিক কার্য্য অপূর্ব্ব নিয়মে চলিয়া বিশ্বেশ্বরের অচিন্ত্য কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যেমন ভৌতিকপদার্থের প্রেম। সেই আকর্ষণশক্তি যেমন আধার ও অবস্থাভেদে কৈশিকাকর্ষণ আকর্ষণ শক্তি, তেমনি আত্মার মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ উক্ত প্রেম পাত্র ও প্রকারভেদে স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, সৌহার্দ্দ্য, দয়া ইত্যাদি ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হয়। অতএব কি প্রণালী মতে অপরের প্রতি সেই প্রেম সঞ্চালিত হয়, তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

অপর লোক সকলের মধ্যে আপনার অব্যবহিত পরেই আত্মীয় অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করা যায় তাহাদের প্রতি অনুরাগ জন্মে। আত্মীয়বর্গের মধ্যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি। যদিও পিতা মাতার প্রতি অনুরাগ প্রথম অনুভূত হয় এবং সেই অনুরাগ পরম পবিত্র ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তথাপি অনুরাগের প্রকৃত প্রাবল্য বা আকর্ষণ বিবেচনা করিলে সন্তানের প্রতি যে স্নেহ, তাহা পিতা মাতার প্রতি ভক্তি অপেক্ষা অধিক। পরে ভ্রাতষ্পুত্র ভাগিনেয় ইত্যাদি ক্রমে সম্পর্ক যত দূর হইবে, উক্ত অনুরাগও তত হীনবল হইয়া থাকে। আত্মীয়বর্গ মধ্যে শুদ্ধ সম্বন্ধের নৈকট্য

প্রযুক্ত অনুরাগের তারতম্য হয় এমন নহে,সহবাস প্রযুক্ত সেই অনুরাগের যেমন প্রাবল্য হয়,পৃথক্ থাকা প্রযুক্তও তেমনি তাহার হ্রাস হয়। সেই কারণে কোন সম্পর্ক না থাকিলেও বাসস্থানের সান্নিধ্য প্রযুক্তই প্রতিবাসীদিগের সহিত একপ্রকার আত্মীয়তা এবং পরস্পরের প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মে। এই কারণ প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পার কোন সম্পর্ক না থাকিলেও অনেকস্থলে সম্পর্ক পাতান যায় এবং একত্র বাস ব্যতীত যাহাদের সহিত একত্র বিষয় কর্ম্ম করা যায়, তাহাদিগের সহিতও একপ্রকার আত্মীয়তা ও অনুরাগ জন্মে। বাল্যকালে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত এবং পূর্ণবয়স কালে সহকর্ম্মী দিগের সহিত নিয়ত আলাপ এবং পরস্পরের বাধ্যবাধকতা প্রযুক্ত বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মে, বিশেষতঃ পাঠ্যাবস্থায়মনে সাংসারিক চিন্তা ও স্বার্থপরতার প্রাবল্য না থাকাতে সহপাঠীদিগের মধ্যে অনেক স্থলে যেমন আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য দেখা যায়, তেমন প্রায় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পদোন্নতি বা লাভপ্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়ে স্বার্থপরতা প্রবল হইয়া সহকর্ম্মী দিগের মধ্যে ততদূর আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য হয় না। বস্তুতঃ সৌহার্দ্দ্য সম্বন্ধ পরস্পরের আন্তরিক ভাবের সমতা প্রযুক্তই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সেই সম্পর্ক যত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও সদ্‌গুণদ্বারা সম্বদ্ধ হয়, ততই তাহা স্থায়ী ও শুভ-ফলপ্রদ হয়, নতুবা স্থায়ী ও প্রকৃত বন্ধুতা জন্মে না। এক ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহা ইংরাজি ভাষায় ভ্রাতৃপদে বাচ্য, এবং এ দেশের পুরাতন ব্যবহারানুসারে জাতিপদে বাচ্য, কিন্তু এক্ষণে জাতিধর্ম্ম লোপদ্বারা স্বজাতীয় এবং সম-ব্যবসায়ী এই দুই পদার্থ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,কেননা এক্ষণে জাতি প্রায় কিম্ভূত কিমাকার অভিপ্রায়হীন নিরর্থ পদার্থ হইয়াছে। এক বংশ-সম্ভূত, এক গ্রাম নিবাসী, এক কার্য্য ব্যবসায়ী, এক নগরবাসী, ও এক দেশীয় ইত্যাদিক্রমে আমাদের সম্বন্ধের যত দূরতা হয়, তত অনুরাগের হ্রাস হয়। তন্মধ্যে এক ধর্ম্মাবলম্বী বা এক মতাবলম্বী হইলে যেরূপ অনুরাগ থাকে, ভিন্নমত বা ভিন্নধর্ম্মপ্রযুক্ত সেরূপ হয় না, তাহার অনেক হ্রাস হয়। কিন্তু স্বদেশের সীমা পর্য্যন্ত অনুরাগের বিস্তৃতি দ্বারা প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধে যদিও ইহা হীনবল হয়, তথাপি সমাজসম্বন্ধে ইহার বিলক্ষণ প্রাবল্য দেখা যায়। আত্মীয়া-নুরাগ, পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, দাম্পত্যপ্রীতি, আত্মহিতানুরাগ কিছুই স্বদেশানু-

তাঁহার কার্য্যের রীতি এবং উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম ও পরিমিতাচরণ দ্বারা ভাবী ও স্থায়ী সুখলাভে যত্ন করেন। তিনি তাঁহার আয়ের পরিমাণানুসারে ব্যয়ের সীমা নির্দ্ধারিত করেন এবং অবস্থা বুঝিয়া বরং উপস্থিত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন এবং সেই সঞ্চয় যত্নপূর্ব্বক রক্ষা ও বৃদ্ধি করেন, কোন মতে অনিশ্চিত লাভের প্রত্যাশায় তাহা নিয়োগ করেন না। কোন সংস্রব না থাকিলে তিনি অপরের কার্য্যে হস্তার্পণ করেন না, অপরের কথায় কর্ণপাত করেন না, আপনার কার্য্যেই সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকেন, অপরকে অযাচিত পরামর্শ ও প্রদান করিতেন না। স্বদেশ হিতার্থে তাঁহার পরামর্শ বা পরিশ্রম আবশ্যক হইলে তিনি তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করেন, কিন্তু উপযাচক হইয়া কোন পদোন্নতি বা গৌরবের প্রত্যাশা করেন না।

আত্মহিতানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয় ধর্ম্ম না হউক, অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার যত্ন আপনি করিতে পারে না, তাহাকে কেহ বা অগ্রাহ্য করে, কেহ বা ঘৃণা করে, কেহ বা দয়ার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আত্ম-হিতানুরাগ মনুষ্যের প্রথম ধর্ম্ম। কিন্তু স্বার্থানুরাগী হইয়া সর্ব্বসাধারণের অহিত চেষ্টা করা অতি নীচাশয় লোকের কার্য্য। আত্মহিতানুরাগকে পরিমাণ দণ্ডস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পরহিতানুরাগী হইবে। আমি যেরূপ আমার সুখ সাধনে রত থাকি, সকল লোকই সেইরূপ নিজ ২ সুখ সাধনে রত থাকে এবং আমারও যেমন আপনার সুখ সাধনে চেষ্টা করিতে অধিকার, তেমনি সকলেরই অধিকার আছে। লোক মাত্রেই স্বত্ব বিষয়ে সমান। যত লোক তত অবস্থাভেদ আছে, কিন্তু কি ধনী কি দরিদ্র, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলেরই স্বত্ব সমান, তাহার কিছু মাত্রই প্রভেদ নাই। বল বিদ্যা ধন সম্পদ কিছুতেই স্বত্বের তিল মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। সকলেই এক জগৎপিতার পুত্রকন্যা, তাঁহার দৃষ্টিতে সকলেই সমান। অতএব যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি অপরের কোন হানি না করিয়া আপনার ইষ্টসাধনে যত্ন করে, সেপর্য্যন্ত তাহাকে নিবারণ করিবার কাহারও অধিকার নাই। আমি যথেচ্ছা-অঙ্গচালনা করি, বা ধনের ব্যবহার করি, বা বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চালনা করি,

বা ধর্ম্মযাজনা করি, যে পর্য্যন্ত অপর কাহারও কোন হানি না করি, সে পর্য্যন্ত কাহারও কিছু প্রতিপক্ষতা করিবার অধিকার নাই। আমি কেবল ঈশ্বরের নিকট দায়ী; কিন্তু যেই মাত্র কোন কার্য্য দ্বারা অপরের হানি হয়, তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য নিবারণ করিতে অপরের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। সেই অধিকার অনুসারে সমাজের শাসন প্রণালী ও দণ্ডনীতি নিয়মিত হইয়া থাকে। আত্মহিতে প্রবৃত্তি ও পরের অহিত হইতে নিবৃত্তি এককালে অভ্যাস হইয়া থাকে, কেন না লোকমাত্রেরই স্বত্ব সমান। এই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান মনুষ্যের মনে থাকাতে যে পরিমাণে আত্মহিতে প্রবৃত্তি হয়, সেই পরিমাণে পরের অহিত হইতে নিবৃত্তি হয়। আমি যে পরিমাণে আপন হিত অভিলাষ করি, অপর সকলেই আপন আপন হিত সেই পরিমাণেই অভিলাষ করে, অতএব সেই পরিমাণেই অপরের অহিত হইতে বিরত থাকিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরেষাং ন তদাচরেৎ।" আপনার যাহা অপ্রিয় সে ব্যবহার অপরের প্রতি করা কর্ত্তব্য নহে। এইটি ন্যায়পরতা ধর্ম্মের মূল।

কুপ্রবৃত্তি-প্রধান ব্যক্তি অপরের সুখের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আপনার সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকে, সুতরাং সে ব্যক্তি বলদ্বারা বা ভয়প্রদর্শনদ্বারা অপর লোককে পীড়ন করিয়া স্বার্থসাধন করিতে সঙ্কুচিত হয় না, নিজের কোন বস্তুর অভাব হইলে চৌর্য্য বা প্রতারণা দ্বারা অপর লোকের বস্তু গ্রহণ করিতে ধাবমান হয় এবং আপনার গৌরব সাধনার্থ আবশ্যক হইলে অম্লানবদনে অপরের গ্লানি করিয়া থাকে। কিন্তু উক্তরূপে কুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে পরিমাণে আত্মসুখ সাধন করা যায়, সেই সকল প্রবৃত্তিকে দমন করিলে তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আত্মহিত সাধিত হইতে পারে— ফলতঃ এইরূপে কুপ্রবৃত্তিজনিত দুষ্কর্ম্মের ফল হইতেও বিমুক্ত থাকা যায়, এবং রিপুক্ষয়জনিত জয়োল্লাসে মনে অতুল আনন্দানুভব হয়।

আত্মহিতানুরাগ প্রণালী ক্রমেই অর্থাৎ সকলে আমার উপকার করুক, এই ইচ্ছা থাকাতে আমিও অপরের উপকার করি এই প্রবৃত্তি হয়। সকলেই আপনাকে কেন্দ্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সকল বস্তুই আপনার সুখের নিমিত্ত মনে করিয়া থাকেন। কথায় বলে "যে যার আপনার দিকেই টানে," সুতরাং

রাগের সহিত তুল্য-বল নহে, এবং স্বদেশ-হিতার্থে যে ব্যক্তি আত্ম জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করে তাহাকে সকলে ধন্য বলিয়া মানে, স্বদেশের উন্নতি সাধনে ও গৌরব রক্ষার্থে যাহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, তাহাকে সকলে সুপণ্ডিত বলিয়া গনন করে, এবং স্বদেশ রক্ষার্থে যে ব্যক্তি শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করেন,সকলে তাহাকে যথার্থ বীর বলিয়া চিরস্মরনীয় করিয়া রাখে। স্বদেশানুরাগের ন্যায় প্রবল ও প্রশংসনীয় অনুরাগ আর কিছুই নাই। অনুরাগ স্বদেশকে অতিক্রম পূর্ব্বক মানব জাতি মাত্রে সম্প্রসারিত হইয়া লোকানুরাগ নাম ধারণ করে। নিষ্কাম লোকানুরাগ অতি মহৎ ধর্ম্ম। সকল মনুষ্যই এক পরম পিতার পুত্র, এই সম্বন্ধ সূত্রে কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল কি হিন্দু কি যবন সকলকেই সমানভাবে দয়া করা, ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধ পথ্য দান, শিক্ষার্থীকে বিদ্যা দান করা,—যাহার যেরূপ দুঃখ বা অভাব তাহা বুঝিয়া, অর্থাৎ অপর ব্যক্তির আত্মার স্থানে আপন আত্মাকে অধিষ্ঠিত করিয়া অপর ব্যক্তির কি কি দুঃখ বা অভাব আছে তাহা আপনার আত্মাতে অনুভব করিয়া,আপনার সাধ্যানুসারে ধন দ্বারা পরিশ্রম দ্বারা, কথা দ্বারা, যে কোন প্রকারে সেই দুঃখ মোচন করা, সেই অভাব দূর করা সকল ধর্ম্মের সার, ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত পরম ধর্ম্ম।

নারিচরীত।

ফতেমা বিবী।

নারীকুলরত্ন ফতেমা মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের কন্যা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম খদিজা। তিনি বাল্যকালেই মাতৃহীনা হন। ফতেমা পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আট বৎসর কাল তিনি যেরূপ অসাধারণ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত পিতার সেবা করিয়াছিলেন এরূপ কোন কন্যা কখনও করিয়াছেন কি [না সন্দেহ; ফতেমা যেমন পিতৃগত-প্রাণা ছিলেন, মহম্মদ তদ্রূপ দুহিতৃ-বৎসল ছিলেন। মহাত্মা মহম্মদ তাঁহাকে ক্ষণকাল চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে কষ্ট বোধ করিতেন। পিতার স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশে

ফতেমা শৈশবকাল হইতে অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল। ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে সেই সৌন্দর্য্য আবার সমধিক উজ্জল হয়। তিনি সর্ব্বদা দীন বেশে থাকিতেন। যৌবন কালেও ভোগ বিলাসে কিছুমাত্র মনঃসংযোগ করেন নাই। ধর্ম্ম সাধনায় ও কঠোর বৈরাগ্য ব্রত পালনে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। পরম ধার্ম্মিক আলিকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত হোসন ও হোসেনের জন্ম হয়। ফতেমার জন্ম বৃত্তান্তাদি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উক্তি আছে। এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা অনাবশ্যক। কেবল তাঁহার জীবনের দুই একটী সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

একদা কোরেশ্ বংশীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক মহাপুরুষ মহম্মদের নিকটে আসিয়া বলিল, "হে মহম্মদ! যদিচ ধর্ম্ম মতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য নাই, কিন্তু সম্বন্ধে আমরা নিকট—এক নগরবাসী ও প্রতিবেশী। ইচ্ছা করি না যে সম্পূর্ণরূপে তোমার সঙ্গে বান্ধবতা ছিন্ন হয়। অদ্য এক বিবাহ আছে, তোমার অমুক আত্মীয়াকে অমুকের সঙ্গে বিবাহ দিতেছি। আমাদের ইচ্ছা যে তোমার কন্যা ফতেমা বিবাহভবনে যাইয়া আত্মীয়তাপ্রদর্শন ও উদ্বাহোচিত কার্য্যসম্পাদন করে।" মহম্মদ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন "ভাল, আপনারা গমন করুন। আমি ফতেমাকে পাঠাইব।" তাহারা চলিয়া গেল। মহম্মদ ফতেমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎসে! লোকের সঙ্গে সদ্ভাব করিব, শত্রুর উৎপীড়ন সহ্য করিব। শত্রুতা রূপ বিষকে কৃতজ্ঞতা রূপ সুধার সঙ্গে তুল্য করিয়া গণনা করিব। অদ্য আরবের ভদ্র লোকেরা আমার নিকটে আসিয়া এই আবেদন করিয়াছেন, যে তুমি তাঁহাদের ভবনে বিবাহ সভায় উপস্থিত হও। আমি তোমাকে পাঠাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। তুমি কি বল?" ফতেমা বলিলেন "ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের যাহা আদেশ তাহাই হইবে। আমি আজ্ঞাধীনা দাসী, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। পিতঃ তোমার আদেশে আমি বিবাহ সভায় যাইব বটে, কিন্তু ভাবিতেছি কোন্ বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইব। অন্যান্য মহিলারা মহামূল্য রমণীয় পরিচ্ছদ সকল পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবে। আমার সামান্য বস্ত্র, জীর্ণ চাদর দেখিয়া তাহারা হাস্য উপহাস করিবে। আত্বার ভার্য্যা শিবার কন্যা আবুজোহিলের ভগিনী ও অন্য অনেক আরবীয়

মহিলা কিরূপ অসত্যাচারিণী ও মন্দপ্রকৃতি, তুমি তাহা ভাল জান। তাহারা সেখানে উপস্থিত থাকিবে। তোমার অবিদিত নাই, হমালতসুতা তোমার গম্য পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তোমার নিন্দা ব্যতীত আবুসফিয়ানের স্ত্রীর অন্য কোন কার্য্য নাই। তাহারা সেই সভাতে উপস্থিত থাকিবে। সেই সকল রমণী রোম ও মিশর দেশীয় মহামূল্য বস্ত্রে, এরাকের অলঙ্কার পুঞ্জে ও মণিমুক্তা খচিত কিরীটে বিভূষিত হইয়া সুবর্ণ মণ্ডিত উচ্চ উপধানে পৃষ্ঠস্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট থাকিবে। সেই সভাতে তোমার কন্যাকে বেশভূষাবিহীন জীর্ণ চাদরে আবৃত হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। তাহারা আমাকে দেখিলেই বলিবে এই বালিকার কি ঘটিয়াছে? ইহার মাতার প্রচুর সম্পত্তি ছিল তাহা কি হইল, কেন এরূপ বেশে আসিয়াছে? পিতঃ। ইহাদের ধর্ম্ম জ্ঞানের চক্ষু নাই। ইহাদের সকলেরই দৃষ্টি বাহ্য জগতে বদ্ধ। ইহারা এই উপলক্ষে তোমার কত কুৎসা করিবে। আমা দ্বারা তোমার অপমান হইবে, ইহা আমার অসহ্য।

ফতেমা এই প্রকার অনেক কথা বলিতেছিলেন ও অশ্রুমোচন করিতে ছিলেন। তখন মহম্মদ বলিলেন " বৎসে! দুঃখিত হইও না, আমার নিকটে উত্তম পরিচ্ছদ ও সুন্দর আভরণের কিঞ্চিন্মাত্র মূল্য ও মর্য্যাদা নাই। অদ্য যাহারা পীত ও লোহিতাদিবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কুসুমের ন্যায় অহঙ্কারের উদ্যানে শোভা বিস্তার করিতেছে, কল্য তাহারা অকিঞ্চিৎকর তৃণের ন্যায় নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। বৎসে! আমাদের গৌরব বৈরাগ্য বস্ত্রে।"

মহম্মদ এ বিষয়ে আরও কিছু বলিলে ফতেমা কহিলেন " আমি তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারিণী নহি, আমার আর বিলম্ব করিবার সাধ্য নাই।" এই বলিয়া তিনি পিতৃ-গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন, কোন লোক জন সঙ্গে না লইয়া একাকিনী বিবাহ সভায় চলিয়া গেলেন। কথিত আছে যে সেই সময়ে ফতেমা অলৌকিক কৌশলে দিব্যাভরণ ও বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১) কোরেশ বংশীয় নারী

(১) আমাদিগের পুরাণে যেমন আছে দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় শিবানী মলিন ছিন্নবস্ত্রে যাইতেছিলেন, পথে ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানা রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দেন, মহম্মদের কোন ধনাঢ্য ভক্ত পথে তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাইয়া সেইরূপ সজ্জিত করিয়া দিয়া থাকিবেন আশ্চর্য্য নহে।

গণও আরবীয় মহিলাগণ পথের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিল যে এইক্ষণেই মহম্মদের কন্যা জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া আগমন করিবে। আমাদের সুশোভন অলঙ্কার পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই সে মনে কষ্ট পাইবে। ঈর্ষ্যাগ্নি তাহার অন্তরে শিখা বিস্তার করিবে। তাহারা এই ভাবে চিন্তা করিতেছিল এমত সময়ে সংবাদ পহছিল যে ফতেমা উপস্থিত। যখন ফতেমা গৃহাভ্যন্তরে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে গৃহ সমুজ্জ্বল হইল, তিনি উপনীত হইয়াই মুসলমান জাতির পদ্ধতি অনুসারে সভাস্থ মহিলাদিগকে বিনীতভাবে সেলাম করিলেন। কোরেশকামিনীগণ বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা আর সেলামের প্রত্যুত্তর দান করিতে পারিল না, সেই বিনয় ও শীলতার মূর্ত্তিস্বরূপ ফতেমাকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষু স্থির ও বুদ্ধি জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তাহারা আসন হইতে উঠিয়া গিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল হাঁগা ইনি কোন্ রাজার কন্যা? কোন্ নরপালের মহিষী? এই কে অকস্মাৎ সভাস্থলে উপস্থিত। ইহা ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ, ও সৌভাগ্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা বটে, এই অভাগাদিগের গৃহে ইনি চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন কেন? ইহাঁর রূপের আলোকে যে চন্দ্র সূর্য্য পরাস্ত হইল পরে যখন তাহারা জানিতে পাইল ইনি ফতেমা, তখন তাহাদের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা সমুখস্থ উচ্চ সিংহাসন ফতেমাকে প্রদান করিয়া এক পার্শ্বে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। কতকগুলি মহিলা বিনীতভাবে নিবেদন করিল "হে মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয় দুহিতা! আমরা তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, ইহাতে তোমার গৌরবান্বিত হৃদয় ক্ষুন্ন হইয়া থাকিবে। তুমি কিছু আদেশ কর, যাহা তোমার প্রসন্নতার কারণ হইবে, তাহা আমরা সম্পাদন করিব। বল তোমার জন্য কি প্রকার খাদ্য সামগ্রী ও কিরূপ সরবত আনয়ন করিব।" ফতেমা বলিলেন "খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে আমার সন্তোষ নাই। ভোগ সুখে বিরাগ আমার এবং আমার পিতৃদেবের স্বভাব। আমরা অনশন ব্রত পালন করি। আমার সন্তোষ আমার পূজনীয় পিতার সন্তোষে বরং ঈশ্বরের প্রসন্নতাতে। তোমরা পৌত্তলিকতার অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীর হইতে বাহির হইয়া জ্যোতির রাজ্যে আগমন কর, ধর্ম্মেতে বিশ্বাসী হও, প্রভুর সঙ্গে প্রীতি স্থাপন কর, শত্রুতা পরিহার কর। কতকগুলি মহিলা ফতেমার কথা শ্রবণে ও তাঁহার অলৌকিক প্রভাব

দিকে তাকাইলেন। তখন আলির নেত্রদ্বয় হইতে শোকাশ্রু বিগলিত হইয়া ফতেমার মুখমণ্ডল অভিষিক্ত করিল। ফতেমা আলিকে রোরুদ্যমান দেখিয়া বলিলেন, "নাথ। আক্ষেপ করিবার সময় নয়, এক্ষণে অন্তিম কথা শ্রবণ করিবার সময়।" আলি বলিলেন 'কি কথা বলিবে বল।" ফতেমা বলিলেন "চারিটী কথা বলিবার ইচ্ছা। এক, যদি আমাহারা এমত কোন আচরণ হইয়া থাকে যাহাতে তোমার মনে ক্লেশ হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর ও আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" আলি বলিলেন, "প্রিয়তমে! এতকাল কখন কথায় কি আচরণে তোমাহইতে এমত কিছুই প্রকাশ পায় নাই, যাহা আমার মনঃক্ষুন্নের কারণ হইবে। তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয়রঞ্জিনী ছিলে, কখন মনঃপীড়াদায়িনী ছিলে না; তুমি সন্তাপ-হারিণী ছিলে, জীবনের উপদ্রব কারিণী ছিলে না। তোমাকে আমি উপকারিণী পাইয়াছি, অপকারিণী নয়। তোমাকে পুষ্পের ভাবে দেখিয়াছি, কণ্টকের ভাবে নয়। অন্য কথা কি আছে বল।" ফতেমা বলিলেন "আমার স্নেহের হোসন হোসেনের প্রতি বাৎসল্য রাখিবে। তাহাদিগকে ভুলিবে না, স্নেহের হস্ত তাহাদের মস্তক হইতে উত্তোলন করিবে না, তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবে। তৃতীয় রজনী যোগে আমার শব ভূগর্ভশায়ী করিবে। তাহাহইলে জীবদ্দশাতে যেমন কোন পরপুরুষের দৃষ্টি আমার শরীরে নিপতিত হয় নাই, মৃত্যুর পরেও হইবে না। ৪র্থ আমার সমাধি ভূমিতে গমনাগমন করিবে।" ইতিমধ্যে হোসন হোসেন আসিয়া জননীর মৃত্যু নিকটে জানিয়া অনেক ক্রন্দন বিলাপ করে। ফতেমা নানাপ্রকার বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সমাধি উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। অনন্তর তিনি কোন আত্মীয়ার সাহায্যে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান করেন ও এক নির্জ্জন গৃহে যাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই লোকান্তরে চলিয়া যান।

স্বাধীন শুক।

স্বজন বিহঙ্গ সঙ্গ করি পরিহার
ত্যজিয়া বিনোদ-কর বিপিন বিহার॥
ভুলিয়া স্বভাবসিদ্ধ শূন্য বিচরণ।
দেশ দেশান্তরে আর না কর ভ্রমণ॥

পরের অধীন হয়ে বন্ধন ভিতরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

কি দোষে মনুষ্য বন্দী করিল তোমায়।
পরাধীনতার হার পরাইল পায়॥
আহা! কি নিষ্ঠুর নর বিনা অপরাধে।
বনের বিহঙ্গে বৃথা কি বিবাদে বাঁধে॥
নাহি পরাধীন সম দীন চরাচরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

না পাও থাকিতে আর কানন বিজন।
না পাও বনের ফল করিতে ভোজন॥
না পাও স্বজাতি সহ করিতে প্রণয়।
না পাও পূরাতে সাধ মনে যত হয়॥
না পাও খেলিতে সুখে বিচরি অম্বরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

না পাও তরুর শাখে করিতে বিশ্রাম।
না পাও দেখিতে বনে ফল পুষ্পদাম॥
না পাও জনম ক্ষেত্র করিতে দর্শন।
না পাও করিতে কিছু স্বহিত সাধন॥
না পাও উড়িতে, মিলি বহু সহচরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

দুগ্ধ রসে মুগ্ধ হয়ে লুব্ধ সদা মন।
নরের আদরে হ'লে আত্ম বিস্মরণ॥
ছাড়িলে আপন বোল হয়ে পরাধীন।
তুষিতে প্রভুর মন ব্যস্ত নিশি দিন॥
না বুঝিয়া বল সদা "রাধা কৃষ্ণ হরে"।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

দর্শনে মোহিত হইয়া গেল এবং তাহারা "লা এলা আলা আল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" (ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত) এই কল্মা (বাক্য) উচ্চারণ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

ফতেমা কোন বিশেষ রোগে আক্রান্তা হইয়া পরলোক গমন করে কি না, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃ বিয়োগ শোকই তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারন বলিয়া প্রতীত হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর ফতেমা শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছিলেন না, দিবা রাত্রি ক্রন্দন করিতেন, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেন। এক দিবস তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। আপন স্বামী আলিকে ডাকিয়া বলেন যে "কল্য পিতৃদেবকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন তিনি শিয়রে বসিয়া কাহার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি দৌড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম পিতঃ! তোমার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় দগ্ধ ও শরীর শীর্ণ হইয়াছে। পিতৃদেব বলিলেন আমিও এখানে প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি বলিলাম পিতঃ সে কে, তুমি কাহার প্রতীক্ষা করিতেছ? কহিলেন তোমার প্রতীক্ষায় আছি, হে ফতেমা! বিচ্ছেদ যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার জন্য আমার প্রাণ আকুল। তোমার শরীর ত্যাগ করিবার এই তো সময় বটে। এক্ষণে আত্মাকে শরীর সম্পর্ক শূন্য কর—এই নিকৃষ্ট সঙ্কীর্ণ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রসারিত উন্নত জগতে গৃহস্থাপন কর। সংসার রূপ ক্লেশের কারাগার হইতে আনন্দকর পরলোক উদ্যানের অভিমুখে চলিয়া আইস। ফতেমা! তুমি না আসিলে আমি যাইব না।" আমি বলিলাম "পিতঃ! আমিও তোমার দর্শনার্থী। তোমার সহবাস সম্ভোগ করি, সর্ব্বদা আমার এই আকাঙ্ক্ষা।" তাহাতে তিনি বলিলেন "তবে শীঘ্র চলিয়া আইস, কল্যই আমার নিকটে আসিবে।" পরে আমি জাগরিত হইলাম। সেই উন্নত লোকে যাইবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে অদ্য দিবাবসানে কি নিশার প্রথম ভাগে ইহলোক হইতে যাত্রা করিব। আমি গেলে আমার মৃত্যুতে তুমি শোকাকুল হইবে, কল্য আমার সন্তানগণ ক্ষুধাতুর না থাকে, এজন্য রুটি প্রস্তুত করিতেছি, পুত্র কন্যার বস্ত্র ধৌত করিতেছি। আমি চলিয়া গেলে কাল কে আর তাহা করিবে? এজন্য আমিই একাজ করিতেছি। আমার অভাবে কল্য কে আমার নিরাশ্রয় শিশুদিগের

মন যোগাইবে ? আমি ইচ্ছা করিয়াছি তাহাদের কেশ বিন্যাস করিব। জানি না আমি চলিয়া গেলে তাহাদের মুখের ধূলি কে ঝাড়িয়া দিবে।"

আলি ইহা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করেতে লাগিলেন এবং বলিলেন "ফতেমা! আজ পর্য্যন্ত তোমার পিতৃ বিয়োগের শোক আমার অন্তরে রহিয়াছে। সেই মহাত্মা যে আঘাত করিয়া গিয়াছেন, অদ্যও তাহার যন্ত্রণা যায় নাই। আবার তোমার বিয়োগ উপস্থিত। আঘাতের উপর আঘাত, বিপদের উপর বিপদ।" ফতেমা বলিলেন "আলি! সেই বিপদে ধৈর্য্য ধারন করিয়াছ, এই শোকেও সহিষ্ণু হইবে। এক্ষণে এক মুহূর্ত্তও আমা হইতে দূরে থাকিও না। আমার নিশ্বাস বায়ুর অবসানের সময় হইয়াছে। নিত্য ধামে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে এই অঙ্গীকার রহিল। ইহা বলিতে-ছিলেন এবং হোসেন হোসেনের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করতঃ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। মাতার কথা শ্রবণ করিয়া হোসেন হোসেনও কাঁদিতে লাগিল। ফতেমা বলিলেন "বৎসগণ! কিকিৎকাল তোমরা মাতা-মহের সমাধি স্থানে যাইয়া প্রার্থনা কর এবং আমার জন্য প্রার্থনা কর। তাহারা জননীর আজ্ঞানুসারে চলিয়া গেল। পরে ফতেমা উপধানে পৃষ্ঠ স্থাপনপূর্ব্বক আলীকে বলিলেন "প্রিয়তম! নিকটে বস, বিদায়ের সময় উপস্থিত।" আলি বসি-লেন, রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ফতেমা আস্‌মা নাম্নী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন "অন্ন প্রস্তুত কর, আমার স্নেহের হোসেন হোসেন ফিরিয়া আসিলে আহার করিবে। গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে অমুক স্থানে বসাইয়া ভোজন করাইবে। আমার নিকটে আসিতে ও আমার অবস্থা দেখিতে দিবে না।" আস্‌মা তদনুরূপ আচরণ করিল। এদিকে ফতেমা আ-লিকে বলিল "ক্ষণকাল আমার নিকটে থাক, ও আমার মস্তক তোমার ক্রোড় দেশে স্থাপন কর, জীবনের অল্প অবশিষ্ট।" আলী বলিলেন "ফতেমা" তোমার এপ্রকার কথা শ্রবণ ও এপ্রকার ভাব দর্শন করিতে আমি অক্ষম।" ফতেমা কহিলেন "আলি! প্রাণ যায়, আমাকে প্রস্থান করিতেই হইতেছে, মন শোকাকুল, সর্ব্বথা মনের কথা তোমাকে কিছু বলা কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমার কথা শ্রবণ কর, আমার বিচ্ছেদের সরবত বাধ্য হইয়া পান কর।" আলি বসিয়া ফতেমার মস্তক অঙ্কদেশে স্থাপন করিলেন। ফতেমা চক্ষু উন্মীলন করিয়া আলির মুখের

দেখ হে স্বাধীন শুক ভেবে একবার।
জঠর অনল জলে যখন তোমার॥
তৃষ্ণায় শুকায় কণ্ঠ হও রে কাতর।
প্রভুর প্রত্যাশা করি শুক নিরন্তরে॥
তখন অন্তর ক্লেশ মিশাও অন্তরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

প্রথমে প্রভুর ভাষা বুঝিতে না পারি।
শিখেছ যতনে তাহা যাই বলিহারি॥
সঙ্কেত প্রসঙ্গ বহু শিখেছ এখন।
যোগাতে পরের মন ধর কি জীবন?
দেখিয়া দুর্দ্দশা তব মম আঁখি ঝরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছে পিঞ্জরে?

বিপক্ষে করিলে পক্ষ হ'লে লক্ষ্যহারা।
কি দুঃখে দেখনা চক্ষে স্বাধীনের ধারা॥
নিস্তেজ হইল দেখ স্ব-পক্ষ বিভব।
উড়িবার শক্তি শুক গেল বুঝি তব॥
তব দুঃখ দেখি হাসে মানব নিকরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

বিধবা বিবাহ।

বঙ্গমাতার অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা যে সকল সামাজিক সংস্কার আরম্ভ করিয়াছি, তাহার কিরূপ ফল ফলিতেছে তাহা সময়ে সময়ে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। কোন সংস্কার আরম্ভ করিয়াই স্থির থাকা উচিত নহে। সেই সংস্কার পথে কি কি অন্তরায় কণ্টকস্বরূপ উত্থিত হইতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই অন্তরায়ের দূরীকরণ হইতে পারে, এবং কি কি নূতন অভাবনীয় বিঘ্ন ও বিপত্তি সংস্কার পথে উত্থিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা না করিলে কখন কোন সামা-

জিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আমরা এমত কথা বলি না যে দৃঢ়-প্রোথিত বহুকালের সামাজিক দোষ সকল একদিনে অপনীত হইতে পারে; কিন্তু যত দিনেই অপনীত হইবার সম্ভাবনা হউক না কেন, তৎসাধনোদ্দেশে যত্নের একান্ত শিথিলতা না হয়, মধ্যে মধ্যে তজ্জন্য উৎসাহ ও উদ্যোগ প্রদর্শন নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে যে সমস্ত উদ্যোগ করা হইয়াছিল, অধুনা সেই উদ্যোগের কি একান্ত শিথিলতা ঘটে নাই? এই প্রকার শিথিলতা ঘটিবার কারণ কি, তাহা আমরা কয়জন ভাবিয়া থাকি? অথচ আমাদিগের প্রতিগৃহে বঙ্গবামার দুরবস্থার একশেষ দেখিতে হইতেছে। কে বলে বাঙ্গালী হৃদয়ে মমতা আছে, দয়া আছে; মমতা ও সহৃদয়তা থাকিলে কি আজি বাঙ্গালী আপনার কন্যা ও ভগিনীগণের দারুণ দুঃখ মোচনের জন্য উদ্যোগী হইতেন না?

ঐ দেখুন বালবিধবা যৌবনের পূর্ণ গর্ব্বে রূপে গৃহধ মকে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতার নিকট, জনকের নিকট কত গ্রন্থই অধ্যয়ন করিতে শিখিয়াছেন। গৃহস্থের কাজ কর্ম্মে তাঁহার কেমন অভিনিবেশ ও নিপুণতা। তিনি কেমন সুন্দর ও পরিষ্কার করিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে কেমন নীতি শিক্ষা ও উপদেশ দিতেছেন। জননীর কত বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও জনকের কেমন সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। কেমন সুমিষ্ট বাক্যে অতিথিকে ভিক্ষা দেন। কোন কথা শুনিলে লজ্জায় কেমন বদন অবনত করেন। বিনয়ের সহিত দাস দাসীকে কেমন বশে রাখিয়াছেন। কত সময়ে মাতার অনবধানতা ধরিয়া দিতেছেন। সংসার ধর্ম্মের যাহাতে সুবিধা ও সুপ্রতুল হয়, এমত উপায় দেখিতেছেন। আহা! রূপের সহিত তাঁহার গুণের ক্রমশঃ উন্মেষ হইতেছে। কিন্তু হায়! সেই রূপের সহিত বদনের মলিনতা বাড়িতেছে! অবসর পাইলেই তিনি যেন কি ভাবিতে বসেন। পান সাজিবার সময়ে একাকিনী নির্জ্জনে ও নীরবে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন। সময়ে সময়ে বেশ প্রফুল্ল, আবার সময়ে সময়ে নিতান্ত বিষণ্ণ। জনক জননী কি তাহার এভাব লক্ষ্য করেন নাই? কিন্তু লক্ষ্য করিয়া কি করিবেন? সুশিক্ষিত জনক কন্যার

দুঃখ বিমোচনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজলক্ষ্মীর দুঃখের জন্য জাতি দিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। কন্যার যাহাতে পুনরায় বিবাহ হয় এরূপ চেষ্টাও দেখিয়াছিলেন। বর পান নাই; কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলে কি হইবে, তাহাকে গ্রহণ করে কে? তিনি যেন কন্যার দুঃখ মোচনের জন্য জাতি দিতে স্বীকৃত আছেন; বরপক্ষীয়গণ জাতি দিতে কেন স্বীকৃত হইবেন? পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর শিক্ষিত যুবক দল কিছু উন্নত হইয়াছেন। সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন। কিন্তু সে সমুদায় আশা মিথ্যা, সমুদায় স্বপ্নপ্রায়। উৎসাহ ও ধর্ম্মসাহস সম্বন্ধে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী যেমন ছিলেন, আজি শিক্ষিত হইয়াও তিনি তদ্রূপই আছেন। এই কথা ভাবিয়া তিনি এখন কন্যা বিবাহের উদ্যোগে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

বিধবা বিবাহের প্রস্তাব যখন প্রথম বঙ্গসমাজে অবতারিত হয়, তখন অনেক শিক্ষিত যুবক সাহসী হইয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। দুই একজন বিবাহও করিয়াছিলেন। তখন বিধবা কন্যা পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তখন জনক জননী কন্যার বিবাহ দিতে অগ্রসর ছিলেন না। তখন তাহাদিগের এ সংস্কারে তেমন আস্থা ছিল না। তখন বিধবাগণ নিজেই তত প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আজি দশাধিক বৎসরে, দশ শত বৎসরের কাজ হইয়া গিয়াছে। লোকের প্রবৃত্তি ও ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দুঃখ ও প্রয়োজন কুসংস্কারকে দূরীকৃত করিয়াছে। আজি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে সমাজ ঠিক বিপরীত ভাবে অবস্থিত। পূর্ব্বে কন্যা প্রস্তুত ছিল না, বর প্রস্তুত; এখন কন্যা অগ্রসারিণী, বর পশ্চাৎগামী হইতেছেন।

বিধবাবিবাহের প্রস্তাব যখন প্রথমে উত্থাপিত হয়, যখন বিধবাবিবাহের গোলযোগে বঙ্গসমাজে হুলস্থূল পড়িয়াছিল, যখন জনক জননী বিধবা কন্যার বিবাহদানে তত অগ্রসর ছিলেন না, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আজ না অগ্রসর হউন, কন্যার দুঃখ ও যন্ত্রণা ভাবিয়া ক্রমশ এ প্রস্তাবের উপকারিতা বুঝিবেন ও প্রয়োজনবশতঃ ইহাতে উদ্যোগী হইবেন। কন্যার দুঃখ ও যন্ত্রণা তাহাদিগের হৃদয়কে ক্রমে বিগলিত করিবে। আজি

ক্রমে সেই দিন উপস্থিত। কিন্তু আমাদিগের সমাজ অতি আশ্চর্য্য সমাজ। ইহার একদিকে একটু সুবিধা ঘটিলে, অন্যদিক হইতে অন্যপ্রকার অসুবিধা আসিয়া অমনি উপস্থিত হইয়াথাকে। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে অসুবিধা ছিল, সে অসুবিধা ক্রমে আপনাপনি তিরোহিত হইবে এমত বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল এবং এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাহা ত্বরায় অপনীত হইবার নহে।

ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গসমাজ দিন দিন অধিকতর স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে। আপনার যাহাতে কিছু ক্ষতি হয়, লোকে এখন তাহার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না। পরের জন্য কেন আমি সমাজচ্যুত হইয়া কষ্টে পড়িব—এই স্বার্থপর ভাব লোকের মনে অধিক প্রবল হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন অনূঢ়া কন্যা নানাবিধ স্বর্ণ ভূষণে ভূষিতা ও নানাবিধ মহার্ঘ দান সমগ্রী লইয়া আমার জন্য প্রস্তুত, তখন আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তত লাভ বিসর্জ্জন দিয়া কেন বিধবা বিবাহ করিতে যাইব। এখন এই স্বার্থপর ভাব লোকের মনে প্রবল। সুতরাং বিধবাবিবাহে কেহ অগ্রসর নহেন।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এ স্বার্থপরতা প্রকৃত স্বার্থপরতা নহে। ইহাতে আপাততঃ একজনের লাভ দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে সমাজের ক্ষতি। আজি পরের নিকট যে বহুল অর্থ লইয়া বিবাহ করিতেছি, কালি আমার নিজের কন্যার বিবাহ দিতে হইলে সেই অর্থ ফিরিয়া দিতে হইবে। আজি পরের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলাম না, কালি হয় তো আমার নিজের বিধবা কন্যার বিবাহের প্রয়োজন হইতে পারে। এই সমস্ত ক্ষতি লাভ তুলনা করিয়া দেখিলে কি ফল দাড়ায়? এই তুলনায় কি দৃষ্ট হইবে না যে আপাততঃ যাহাকে লাভ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, তাহা বাস্তবিক ভবিষ্যৎ ক্ষতির কারণ, অথবা যাহাতে আমার লাভ তাহাতে সমাজের ক্ষতি? সমাজের প্রতি আজি আমি যে ব্যবহার করিব, কালি সমাজও সেই ব্যবহার আমাকে ফিরিয়া দিবে।

কিন্তু আর একটি কথা বলিয়া এক্ষণকার শিক্ষিত যুবকগণ বিধবা বিবাহের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। শিক্ষিত যুবকগণ এক্ষণে সমাজতত্ত্বে

প্রবেশ করিতে শিখিতেছেন। তাঁহারা কহেন যে সমাজে প্রতি কন্যার পরিণয় সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক, যে সমাজে বার বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিতে পারিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, সে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেককে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে, অর্থাৎ অনেকের অনূঢ় কন্যার বিবাহ না হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিধবা বিবাহ না হওয়া হিন্দুসমাজের বিধি থাকাতেই এক্ষণে সমস্ত অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হইতেছে, নতুবা তাহা হইত না। লোকে বিধবা বিবাহ করিলে, অনেক অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে, সুতরাং অনেকের জাতিরক্ষা হওয়া দুঃসাধ্য হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থা বলিয়াই স্থির করা উচিত। সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই।

পূর্ব্বে শিক্ষিত যুবকগণ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। আজ কাল তাঁহাদের সে ভাব নাই। আজ কাল লোকের মন হিন্দু সমাজের পক্ষপাতী হইয়াছে। হিন্দু সমাজের ব্যবস্থা মধ্যে সকলই সুনিয়ম দেখিতে চান। হিন্দু সমাজের পক্ষ যতদূর সাধ্য সমর্থন করিতে সকলেই চেষ্টা করেন। বাস্তবিক যাহা অন্যায়, হিন্দু সমাজে তাহা আছে বলিয়া অনেকে অন্যায় বলিতে চাহেন না। আমরা স্বদেশপক্ষপাতিতার প্রশংসা করি বটে, কিন্তু সেই পক্ষপাতিতা নিতান্ত অন্ধ হইলে তাহা কখন প্রশংসনীয় হইতে পারে না। স্বদেশের যাহা কিছু ভাল আছে, যে আচার ব্যবহারে বাস্তবিক দেশের হিতসাধন হইতেছে আমরা তাহার পরিবর্ত্তন জন্য কখন উক্তিমাত্রও করিব না; কিন্তু যাহা বাস্তবিক দুর্ব্যবহার ও দুরাচার তাহার পক্ষ সমর্থন করা কখন প্রকৃত স্বদেশপক্ষপাতিতার কার্য্য হইতে পারে না। তদ্দ্বারা বরং স্বদেশের অনিষ্টসাধন করা হয়।

একথা যদি যথার্থ হয়, তবে দেখা উচিত, উপস্থিত প্রস্তাবে তাহা কতদূর প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে বিচার্য্য এই বিধবাবিবাহ না হওয়া, এবং বাল্য বিবাহকে প্রচলিত রাখা এ উভয়ের মধ্যে কোন টীকে সুব্যবহার বলিয়া ধরিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় শিক্ষিত যুবাগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। সকলেই এক বাক্যে বলিবেন চির-

বৈধব্য সুব্যবস্থা নহে, বালিকা বিবাহও সুরীতি নহে। পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এই দুই ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তন করা উচিত।

আমরাও তাই বলি এ উভয় ব্যবস্থাই একদা পরিবর্ত্তনীয়। যিনি একদিনে সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিতে পারেন, তিনি অন্য নিয়মও সহজে ভাঙ্গিতে পারেন। যাঁহারা বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইতে পারেন, তাঁহারা অপর নিয়মটিও অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারেন। যাঁহারা বিধবা বিবাহ দিয়া হিন্দু সমাজের বহির্ভূত হইলেন, তাহাদিগের কন্যার বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু ইহাতে মূল সমস্যার মীমাংসা হইল না। কথা এই, যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইল, তবে তৎসঙ্গে সকল অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হওয়া সম্ভব কি না? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কি দিব, অপরাপর সভ্য জাতির উন্নত সমাজ এ প্রশ্নের উত্তর দিবে। হিন্দু সমাজ ভিন্ন আর কোন সমাজে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন রীতি প্রবর্ত্তিত নাই। সকল সমাজেই বিধবার পুনঃসংস্কার হইয়া থাকে। অথচ সকল সমাজেই অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজের জাতি প্রথা আর কোন সমাজে প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু যাহারা বিধবা বিবাহের দলভুক্ত হইয়া পড়িবেন, তাহাদিগের মধ্যে জাতি প্রথার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল; তবে আর অন্য সভ্য সমাজ হইতে তাহার বিভিন্নতা কোথায়? তাহারা একটী নূতন সমাজে অবস্থিত হইলেন। সেই সমাজের যাহাতে পরিপুষ্টি সাধন হয়, তখন তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এই নূতন সমাজের একটী সুবিধা এই কাহাকেও এক ঘরে হইতে হইবে না। কারণ বিবাহ কখন এক ঘরে সম্পন্ন হয় না। প্রতি বিবাহে দুইঘর করিয়া সমাজভুক্ত হইবে।

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লইয়া শিক্ষিত যুবকগণকে আর একবার উত্তেজন বাক্যে সম্বোধন করিতেছি, কেন তাহারা বিধবা বিবাহ বিষয়ে এত উদাসীন ও শিথিল যত্ন হইলেন? তাঁহারা নিঃসহায়া অবলা বিধবাগণের জন্য কি দুঃখিত নহেন? তাহাদিগের কি কর্ত্তব্য নয় সেই দুঃখ মোচন করেন? তবে তাঁহাদিগের সুশিক্ষার কি ফল হইল? তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া এ বিষয়ে পুনরায় উদ্যোগী হউন, অবশ্য কৃতকার্য্য

হইবেন। সমাজ তাঁহাদিগের দ্বারা যদি উন্নত না হইল, তবে আর কাহাদিগের নিকট হইতে সে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সকলে দৃঢ়ব্রত হইয়া আর একবার প্রাণপণ চেষ্টায় সমাজের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউন, দেখিবেন এক্ষণে পথ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। কারণ আমরা দেখিয়া আসিতেছি অধুনা দশ বৎসরে দশশত বৎসরের কাজ হইয়া যাইতেছে।

স্বাধীন ও পরাধীন দেশ।

দেশ শাসনের জন্য রাজপদের সৃষ্টি, এবং প্রজা সাধারণের সম্মতিই রাজাকে এই পদের, সুতরাং সমস্ত দেশের অধিকারী করে। তদ্ভিন্ন এই অধিকার পাইবার আর একটি উপায় আছে—সেটী বল। ধন প্রাচুর্য্য, লোক সহায়, বুদ্ধি কৌশল বা অন্য কোন উপায়ে যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়, বা দেশ এতদূর প্রতাপশালী হইয়া উঠে যে অন্য কেহ তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না, তখন সে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা দেশ অপরের উপর অনায়াসে প্রভুত্ব করিতে পারে। এই জন্যই দেখিতে পাই, নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষেরাও নির্ব্বিবাদে আপন পদে প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং এই জন্যই দেখিতে পাই ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন সমাজস্থ অথবা ভিন্ন দেশীয় লোকে কখন কখন দেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে।

যে দেশের শাসন কার্য্য তদ্দেশীয় লোক কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাহাকে স্বাধীন দেশ কহে; এবং ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন দেশীয় অথবা ভিন্ন সমাজস্থ লোককর্তৃক যাহার শাসন কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহাকে পরাধীন * দেশ কহে।

স্বাধীন দেশে রাজার স্বদেশ বাৎসল্য, স্বজাতি স্নেহ, জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনেচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। যে রাজা এ সকল গুণে বঞ্চিত, তাঁহাকেও সমাজের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, কেন না তিনি প্রজাবর্গের সহিত

---

* কাহারও কাহারও মত এই যে দেশীয় হউক, বিদেশীয়ই হউক, যে কেহ দেশ শাসন করুক না কেন, প্রজাদিগের স্বাধীনতা ও স্বত্ব অক্ষুণ্ন থাকিলেই দেশকে স্বাধীন, এবং তাহা না থাকিলে, তাহাকে পরাধীন বলা যায়। এই মতটি শ্রদ্ধেয় বটে, কিন্তু ইতিহাসে এ অর্থে 'স্বাধীন' 'পরাধীন' শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

একই সমাজভুক্ত, সুতরাং তাঁহার স্বার্থ প্রজাবর্গের হইতে বিভিন্ন নহে; যাহাতে সমাজের মঙ্গল তাহাতে তাঁহারও মঙ্গল, আর যাহাতে সমাজের অমঙ্গল তাহাতে তাঁহারও অমঙ্গল। এতদ্ভিন্ন রাজপুরুষগণের সমাজের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার অন্য এক কারণ আছে। তাঁহারা সমাজের অনভিপ্রেত কিছু করিলে সমাজ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে, সুতরাং তাঁহারা অসহায় হইয়া পড়িবেন; তখন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহাদের আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই স্বাধীন দেশে কোন বংশ বা সম্প্রদায় বহুদিন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না। ইহা করিতে গিয়া ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চার্লস্ ও ফ্রান্সাধিপতি ষোড়ষ লুইকে প্রাণদণ্ড স্বীকার করিতে হইয়াছিল, ইহা করাতেই ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমস্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইতে হয়।

কিন্তু পরাধীন দেশে প্রজামণ্ডলী এবং রাজপুরুষ এ উভয়ের মধ্যে উল্লিখিতরূপ কোনও বন্ধন নাই। বিজেতা যখন দেশ হস্তগত করিয়াছেন, তখন প্রজাদের স্বাধীন অভিপ্রায় বা তাহাদের সম্মতি জিজ্ঞাসা করেন নাই; কেবল বলে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। দিগ্বিজয় বাসনা অথবা লুণ্ঠন লালসাতে একটী হীনবল জাতির উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার স্বার্থ বিজিত জাতির সর্ব্বস্ব লইয়া আপন জাতির সুখ ও গৌরব বৃদ্ধি করা। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে কোন সহানুভূতি নাই। বিজিত প্রজাবর্গ যদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তথাপি বিজেতার কোন ক্ষতি নাই কেন না তিনি যে সমাজভুক্ত, তাহা অক্ষুণ্ণ অধিকৃত থাকে, বরং প্রজাবর্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়, ইহা বিজেতার ইচ্ছা, কেন না তাহা হইলে তাঁহার প্রভুত্ব দৃঢ়ীকৃত হয়। যখন বিজিত জাতির উপর রাজত্ব করা অসুখকর অথবা অসুবিধাজনক বোধ করিবেন, তখন বিজেতা স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। এককালে ব্রিটন রোমকদিগের হস্তগত ছিল, তাঁহারা স্বদেশে শত্রুকর্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে অনায়াসে ব্রিটন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রথন প্রথম যে সকল মুসলমান ভূপতি ভারত জয় করিতে আসিতেন, কিছুকাল এখানে অবস্থান করিয়া স্বদেশে কোন গোলযোগ

হইলেই দলবলের সহিত সিন্ধু পার হইয়া যাইতেন। বাস্তবিক যখন কোন জাতি উপনিবেশ স্থাপন না করিবার সংকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে যায়, তখন তাহাদের সেই যাত্রা তীর্থযাত্রার ন্যায় অল্পকাল স্থায়ী।

প্রজাদিগের সহিত বিজেতৃ রাজপুরুষের এই মাত্র সম্বন্ধ যে তিনি প্রভু ও তাহারা দাস। তিনি প্রভুত্ব করেন তাঁহার শক্তি আছে বলিয়া, তাহারা সেবা করে তাহাদের অন্য সহায় অন্য গতি নাই বলিয়া। প্রভু যে দাসকে সুখে রাখেন, তাহার দুইটি অভিপ্রায় আছে ;—প্রথম আন্তরিক ভালবাসা এবং ন্যায় পরায়ণতা ; দ্বিতীয় নীতি কৌশল (policy); সুতরাং তাহাকে সুখে রাখা তাঁহার ইচ্ছাধীন। যখন কোন জাতি কর্ত্তব্যানুরোধে অথবা আন্তরিক স্নেহ বশতঃ বিজিতের উপর মিত্রবৎ আচরণ করেন, তখন বিজিতের মঙ্গল বটে, কিন্তু তিনি যে ন্যায় পরায়ণ এবং স্নেহ পরবশ হইবেন তাহার প্রমাণ কি? 'প্রজাগণ সুখে থাকিলে আমাদেরই লাভ' বিজেতা এই নীতিকৌশল অবলম্বন করিয়া পরাভূত জাতির উপর অধিকাংশ স্থলে সদ্ব্যবহার করেন ; অতএব যখন নীতি কৌশল তাঁহাকে বলিবে পরাজিতের প্রতি উৎপীড়ন শ্রেয়ঃ, তখন তাঁহার উৎপীড়ন কে নিবারণ করিবে? তাঁহার প্রভুশক্তির মূল বল, তাঁহার এই বল সমস্ত বিজিত জাতি সমষ্টির বল অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত।

পদার্থ বিদ্যা।

বারি বিজ্ঞান।*

সমুদায় জড়পদার্থ তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট ; কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। প্রস্তর কঠিন, জল তরল, এবং বায়ু বাষ্পীয় পদার্থ। কাঠিন্য, তারল্য ও বাষ্পীয়ত্ব কোন বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ নিত্য ধর্ম্ম নহে, আকর্ষণ ও বিয়োজন গুণের তারতম্য অনুসারে উহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জল উত্তপ্ত হইলেই,

* এই প্রস্তাবটী লার্ডনারস মেচরেল ফিলসফি, চেম্বার্স হাড্রসটেটিক্স তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি হইতে সংকলিত হইল।

বাষ্প হয়, এবং শীতল হইলেই, কঠিন হইয়া বরফ হয়! জলও যে পদার্থ, বরফ এবং বাষ্পও সেই পদার্থ।

পৃথিবীতে উল্লিখিত ত্রিবিধ বস্তু স্ব স্ব গুরুত্ব অনুসারে উর্দ্ধ্যাধঃক্রমে স্থান বিশেষে অবস্থিত রহিয়াছে। রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধঃ প্রদেশে পতিত হইয়া পৃথিবীর অঙ্গ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; জলীয় ভাগ সমুদ্র, নদী, হ্রদাদি নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া তাহার উপর অবস্থিতি করিতেছে, বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর, এনিমিত্ত কঠিন ও তরল উভয় বিধ পদার্থের উপরিভাগে অধিরূঢ় হইয়া সমুদায় পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মৎস্যাদি জল জন্তু যেমন সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিতি করে, আমরা সেইরূপ বায়ু সমুদ্রে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। আমরা চতুর্দ্দিকে বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি বলিয়াই, তাহা সেবন করিয়া শরীর রক্ষণেও অশেষবিধ সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইতেছি। বায়ু যে নিয়মানুসারে সর্ব্বোপরি অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদের সম্পূর্ণ শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। বায়ু এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত আছে, সে স্থানে না থাকিলে মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, গুল্ম প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় সজীব বস্তু ক্ষণকালের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়।

তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের আকার প্রকার পরস্পর ভিন্ন বটে, কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্যও আছে। জল ও বায়ু উভয়েরই অণু সমুদায় অতি সহজে বিচলিত হয়, এবং উভয়ই উচ্চদেশ হইতে নীচ দেশে প্রবাহিত হয়। যে সমস্ত পদার্থ এইরূপ সহজে বিচলিত হয় ও স্রোত বহিয়া যায়, তাহাদিগকে স্রাবী (fliud) পদার্থ বলে। জল ও বায়ু উভয়ই স্রাবী পদার্থ।

সকল স্রাবী পদার্থ সমান ঘন ও সমান গুরু নহে। মধু ও দ্রব ধাতু এরূপ ঘন, যে তাহাদের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া অতি দুর্ঘট; প্রত্যুত জল, দুগ্ধ ও সুরা অপেক্ষাকৃত তরল, এনিমিত্ত অনায়াসে প্রবাহিত হইতে পারে। আবার, বায়ু এরূপ সূক্ষ্ম যে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর নহে, এবং ইহা প্রবাহিত না হইলে, স্পর্শেন্দ্রিয়েরও গোচর হয় না।

তরল পদার্থের সহিত, বাষ্পের পদার্থের অন্য এক বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু ও বাষ্প অতি সহজে সঙ্কুচিত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলেই, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত ঐ সমুদায় স্রাবী পদার্থ সচরাচর স্থিতিস্থাপক ‡ বলিয়া উক্ত হয়। জল, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থকে সেরূপ সঙ্কুচিত করা যায় না, এনিমিত্ত উহারা অস্থিতিস্থাপক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে তরল পদার্থকেও সঙ্কুচিত করা গিয়াছে। পণ্ডিতেরা ধাতুময় পাত্রে জল রাখিয়া বলে ও কৌশলে তাহা সঙ্কুচিত করিয়াছেন, এবং সমুদ্রের নিম্নভাগের জল উপরিভাগের জল অপেক্ষা যে ঘন ও ভারী, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অতএব, স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক বলিয়া স্রাবী পদার্থের দ্বিপ্রকার লক্ষণ করা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। জল ও বায়ু, তরল ও বাষ্পের পদার্থের উত্তম উদাহরণ স্থল। এই দুই পদার্থের গুণ ও নিয়ম অবগত হইলেই, সমুদায় তরল ও বাষ্পের পদার্থের গুণ ও নিয়ম জানিতে পারা যায়। যদিও জল ও বায়ু, উভয়ই স্রাবী পদার্থ, এবং ঐ উভয়ের অনেক বিষয়ে ঐক্যও আছে, তথাচ কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈলক্ষণ্য থাকাতে, পণ্ডিতেরা ঐ উভয়ের পৃথক বিবরণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সহজে বুঝাইতে বলিয়া অগ্রে জলের বিষয় বর্ণন করাই যাইতেছে।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা জল এক প্রকার স্বতন্ত্র রূঢ় পদার্থ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী অধুনাতন পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, জল রূঢ় পদার্থ নহে, দুই প্রকার বাষ্পের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন তাম্র ও দস্তা মিলিত হইয়া পিত্তল হয়, সেইরূপ অম্লজন ও জলজন নামক দুই প্রকার বাষ্প একত্র মিলিত হইয়া, জল উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা জল বিভাগ করিয়া উল্লিখিত পদার্থ দ্বয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারেন এবং পুনর্ব্বার মিলিত করিয়া জলে উৎপাদন করিতে পারেন।

কোন জল-পূরিত পাত্রে অঙ্গুলি মগ্ন করিলে, অনায়াসে মগ্ন হয়, কিছু মাত্র বাধা বোধ হয় না। ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে, স্বর্ণ হীরকাদির অণু

‡ যে বস্তু টানিলে বাড়ে ও চাপিলে সঙ্কুচিত হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক বলে; যেমন রবার।

সমুদায় পরস্পর পরস্পরের যোগাকর্ষণ গুণে যেরূপ আকৃষ্ট থাকে, জলীয় অণু সমুদায় সেরূপ আকৃষ্ট নহে। অতএব, তাহারা অনায়াসেই বিচলিত হইতে পারে। তাহারা এইরূপ বিচলিত হয় বলিয়া, স্নান আচমন, প্রক্ষালনাদি যে সমস্ত কার্য্যে জলের প্রয়োজন আছে, আমরা তাহা অক্লেশে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হই। (ক্রমশঃ)

পক্ষীদিগের শারীরিক গঠন ও কার্য্যপ্রণালী।

শরীরের সৌন্দর্য্য ও স্বরের মাধুর্য্য জন্য সকল জীবজাতি অপেক্ষা পক্ষী শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যেরা এই জন্য যদিও ইহাদিগকে পুষিয়া থাকে, কিন্তু নির্জ্জন কানন প্রদেশেই ইহাদিগের মনোহর শোভা দেখিয়া এবং স্বরলহরী শুনিয়া প্রাণ বিমোহিত হইয়া যায়। ইহাদিগের হইতে মনুষ্যের ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, ইহাদিগের আমোদ আহ্লাদ যেমন, বিবাদ বিসম্বাদও তেমনি মনুষ্যের প্রীতিকর। ইহারা সকল অবস্থাতেই স্বভাবের বিচিত্র ছবি হইয়া নয়নরঞ্জন করে এবং স্বভাবের স্মৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তাতে মন আকর্ষণ করিতে থাকে। পৃথিবীর কোন অংশই পক্ষিশূন্য নহে। পক্ষিগণ অরণ্যে থাকে, জলে থাকে, মৃত্তিকা মধ্যেও গহ্বর খনন করিয়া বাস করে, যে বায়ুপূর্ণ আকাশ মনুষ্যের অগম্য, তাহা ভেদ করিয়া কতশত সুন্দর পক্ষী বিচরণ করিতেছে।

জগদীশ্বর যে জন্তুর যে প্রকার জীবিকা প্রণালী করিয়াছেন, তাহাকে তাহার উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষীর ন্যায় সকল অবস্থার উপযুক্ত কোন জন্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা বলবান চতুষ্পদদিগের ন্যায় ভূমিতলস্থ উদ্ভিদ প্রভৃতি ভোগ করে, অন্যে বলদ্বারা যাহা করিতে পারে, তাহারা পক্ষের সাহায্যে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে এবং যে শত্রুকে বলে আঁটিতে পারে না, উড্ডয়নদ্বারা সহজে তাহাকে অতিক্রম করে।

পক্ষীকে দেখিলে বোধ হয় যেন পলায়নের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ রচনায় দ্রুতগতি সম্পাদন করা মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয়। ইহা বাতাসের উপরে ভাসিবে বলিয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যতদূর লঘু হইতে পারে হইয়াছে।

মনুষ্যের সহিত তুলনায় পক্ষীদের অঙ্গ রচনা স্থূল এবং অসম্পূর্ণ। তাহারা চতুষ্পদদিগেরও ন্যায় মেধাবী নহে। শরীর তত্ত্ববিদেরা জন্তুর মস্তিষ্কের পরিমাণে তাহার বুদ্ধির পরিমাণ স্থির করিয়া থাকেন। পক্ষীর মস্তিষ্ক তাহার চক্ষুর আকার অপেক্ষা বৃহত্তর নহে, সুতরাং তাহার আর কত অধিক বুদ্ধি হইবে? পক্ষীরা চতুষ্পদ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর এবং চতুষ্পদের ন্যায় মনুষ্যের অনুকরণে সমর্থ হইলেও মৎস্য ও কীটদিগের উপর শ্রেণীস্থ তাহার সন্দেহ নাই। পক্ষীদিগের শরীরের গঠন প্রণালী ও বুদ্ধি উক্ত জীবদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর।

শরীরবিজ্ঞানে যেরূপ যে বস্তু যত জটিল তাহা তত আশ্চর্য্য; শারীর বিদ্যা [illegible] সেইরূপ। মনুষ্য শরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জটিল রচনা [illegible]। চতুষ্পদদিগের গঠন ইহা অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। পক্ষীদিগের শরীরে [illegible] কৌশল দেখা যায়। মৎস্যদিগের ইন্দ্রিয় সংখ্যা আরো অল্প, পতঙ্গ দেহ [illegible] অসম্পূর্ণ, তাহাতে উদ্ভিদ অপেক্ষা বড় অধিক রচনা কৌশল দৃষ্ট হয় [illegible] যত নিকৃষ্ট তাহার শ্রেণীবিভাগও তত অধিক। সর্ব্বজীব [illegible] তিন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, চতুষ্পদদিগের শ্রেণী সংখ্যা আরো অধিক, পক্ষীদিগের আরো বিচিত্র, মৎস্যদিগের তদপেক্ষা অধিক কীট পতঙ্গদিগের শ্রেণী এত অসংখ্য যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহার শেষ করিতে পারে না। মনুষ্য ও চতুষ্পদ জাতি ভূচর, এই জন্য ইহাদিগের গঠনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। পক্ষীরা খেচর অর্থাৎ প্রধানতঃ বায়ুপূর্ণ আকাশে বিচরণ করে, এইজন্য তাহাদিগের গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র।

পক্ষীদিগের বহিরঙ্গ সকল [illegible] সম্পাদনের উপযোগী রূপে সজ্জিত হইয়াছে। তাহাদিগের শরীরের সম্মুখ ভাগ সূক্ষ্মাগ্র বা সূচলো কারন তদ্দ্বারা বায়ু ভেদ করিতে হইবে। পক্ষিদেহ সম্মুখ দিক হইতে ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং নিম্নদিকে বিস্তৃত লাঙ্গুলে পরিণত হইয়াছে, এই লাঙ্গুলদ্বারা শরীর বাতাসে ভাসিয়া থাকে। পক্ষিদেহ দেখিয়াই বোধ হয় মনুষ্য নৌকা বা জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। পক্ষীর বক্ষের ন্যায় জাহাজ ও নৌকার তলা সংকীর্ণ, কারন তাহা দ্বারা সহজে জল ভেদ করা যাইবে। পক্ষীর শরীর জাহাজের খোল, মাথা মাস্তুল, লাঙ্গুল কর্ণ বা হাল এবং পাখা দাঁড় বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

পক্ষীদিগের পালকসকল অতি নিপুণতা সহকারে সজ্জিত হইয়াছে। সকল পালকই এক দিক্ চাপা, ইহাদ্বারা শরীরের উত্তাপ, দ্রুতগতি ও নিরাপদতা এই তিন উদ্দেশ্য এককালে সম্পন্ন হইতেছে। সকল পালকই প্রায় পশ্চাৎ দিকে নত, তাহারা যথাযথ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপরে স্থাপিত। পালকের নীচে ও শরীরের ঠিক্ উপরেই কোমল ও উষ্ণ লোম আছে এবং পালক সকলের বাহিরের দিক্ এরূপ ঘেঁসাঘেঁসি করিয়াআছে, যে তাহার মধ্যে একটী শীতবাত প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু বায়ুর সহিত ভয়ানক ঘর্ষণে পাছে পালক সকল নষ্ট হয় অথবা বায়ুর শৈত্য লাগিয়া পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পক্ষীর পশ্চাৎদিকে একটী তৈলাধার স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, চঞ্চু দিয়া চাপিলেই তাহাহইতে উপযুক্ত পরিমাণ তৈল বহির্গত হয় এবং তদ্দ্বারা বিশৃঙ্খল পালকগুলি পুনরায় সুসজ্জিত হইতে পারে। [illegible] টীর ভিতরে একটী তৈলনালী আছে এবং বাহিরে একটী ছিদ্র আছে। [illegible] চারিদিক্ ঘন পালকে আবৃত। ঝড় বৃষ্টি হইয়া পক্ষীর পালক [illegible] দেখা যায় সে ঘাড় বেঁকাইয়া পশ্চাৎদিক ঠোকরাইতেছে। [illegible] হইতে তৈল বাহির করিয়া যত্নপূর্ব্বক এক একটী পালকে লেপন করে ও পুনরায় তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ সুসজ্জিত করিয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য নিয়ম দেখা যায়, যে সকল পক্ষী গৃহপালিত, তাহাদিগের তত তৈলাধার নাই। মুরগী সকলের পালকে বৃষ্টি লাগিলে ভিজিয়া জাব হয়, তাহা শুকাইতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু যে সকল পক্ষী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগের পালক প্রায় ভিজিয়া থাকে না। যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, জগদীশ্বর সেখানে সেই রূপ আয়োজন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

সুবার্বন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

গত জুলাই মাসে যে ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষা হয়, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় হইতে চতুর্থ পরীক্ষায় ৩, তৃতীয় পরীক্ষায় ৩, দ্বিতীয় পরীক্ষায় ১০ এবং প্রথম পরীক্ষায় ২৭ জন সমুদায়ে ৪৩ জন বালিকা পরীক্ষা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ১২ টী উত্তীর্ণা ছাত্রীর বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। এস্থলে বক্তব্য চতুর্থ

পরীক্ষায় বালিকাগণ যেরূপ ইংরাজী রচনা করিয়াছেন, অনেক এণ্ট্রান্স শ্রেণীর ছাত্রেরা সেরূপ পারেন কি না সন্দেহস্থল।

পরীক্ষা	বয়ঃক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	পূর্ণ সংখ্যা	প্রাপ্ত সংখ্যা
৪র্থ পরিক্ষা		... ...	২৫০	
১। কাদম্বিনী বসু	১৪	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়	"	... ১১৲
২। সারলা দাস	১৪	"	"	... ১৩৮।
৩। সুশীলা ঘোষ	১৮	ভবানীপুর খৃষ্টীয় বালিকা বিদ্যালয়		... ৯৩॥
৩য় পরীক্ষা	...	... ...	২৫০	
৪। স্বর্ণপ্রভা বসু	১৪	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়	"	... ১২৮॥
৫। হেমাঙ্গিনী চৌধুরী	১১	কাঁসারী পাড়া	"	... ১০৩॥
২য় পরীক্ষা	...	... .	২০০	
৬॥ অবলা দাস	১১	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় ..	"	... ১০৯॥
৭। সরলা মহলানবিশ	১১	... ...	"	... ১০৮
৮। প্রিয়বালা মিত্র	১১	কালীঘাট ...	"	... ৯০॥
১ম পরীক্ষা		... ...	২০০	
০। লক্ষ্মীমণি দাসী	১১	টালা	"	... ৮৩৭
১০। ত্রৈলোক্য মোহিনী দাসী	১১	টালা ...	"	... ১৯৮॥
১১। ইন্দুমুখী বসু	১১	কেশেবাগান	"	... ৯৫৶
১২। বামামণি বসু	১৯	মিলম্যান বিদ্যালয় ...	"	... ৯২*
১৩। হেমাঙ্গিনী ঘোষ	৮	কেশেবাগান ...	"	... ৯১॥*

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গয়া জেলার টিকারীর মহারাণী রাজরূপ কোঙর স্বদেশে একটী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। যেহাদের পুরুষদিগের মধ্যে বিদ্যোৎসাহী অতি অল্প আছেন, সেখানে স্ত্রীলোকের এরূপ দৃষ্টান্ত যার পর নাই প্রশংসনীয়।

২। মহারাণীর 'ভারতেশ্বরী' উপাধি সমারোহ সহকারে গ্রহণার্থ আগামী জানুয়ারি দিল্লীতে একটী দরবার বা রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে। লর্ড লিটনই যজ্ঞাধিপতি।

বামাগণের রচনা।

পাপ দুঃখের কারণ।

হায়২ একি হায়, প্রমত্ত বারণ প্রায়,
সর্ব্বদাই মম চিত্ত পাপ দিকে ধায় রে।
নাহি পারি নিবারিতে কুবৃত্তি সবায় রে॥
হয়ে সদা জ্ঞানশূন্য, না বিচারি পাপ পুণ্য,
আমোদের হেতু চিত সেবে রিপুচয় রে।
তাহাদের প্রলোভনে সদা মাতি রয় রে॥
ঠেকিলাম কত দায়, পাপাচারে হায় হায়,
তবু না হইল জ্ঞানী এ পাপ হৃদয় রে।
অহরহ হয়ে রহে উম্মত্তের প্রায় রে॥
পাপের কুহকে মজে, ধরম করম ত্যজে,
বিষয় চিন্তায় যাপে অমূল্য সময় রে।
মলিন সুখের আশে কত দুঃখ পায় রে॥
সদা দেখি ওরে মন, কর সুখ অন্বেষণ,
তবু সুখ ধরা কেন দেখ দুঃখময় রে।
তোমায় পরশে সুখ কেন দুঃখ হয় রে॥
এ ভব সুখের ধাম, বহে সুখ অবিরাম,
সুখাগার এর নাম স্বভাবে জানায় রে।
তবে কেন মন্দ বোধ হতেছে ইহায় রে॥
একি দেখি অনুক্ষণ, কেন হও জ্বালাতন,
বিরক্তি কি মাখা আছে ধরাতলময় রে।
নতুবা চিত্তের তৃপ্তি কেন নাহি হয় রে॥
বিজনে কি লোকালয়, তব তৃপ্তি নাহি হয়,
সদা ম্লানভাবে তব দিন চলি যায় রে।
ভাবিছ কিসের তরে, কাঁদিছ কাহার তরে,
কেন বা বিষাদে তুমি ভাস নিরন্তররে।
অনুক্ষণ কেন তুমি হায়! হায়! কর রে॥

বুঝেছি বুঝেছি হায়, ওহে চিত্ত তব কায়
অনুতাপ পশি বুঝি দহিছে তোমায় রে।
পাপের যে প্রতিফল এড়ান না যায় রে॥
করি কার্য্য অনুচিত, ধর্ম্ম পথ বিগর্হিত,
পেতেছ বেদনা এত জ্ঞান নাহি হয় রে।
পাপ অন্ধকারে হৃদি অন্ধকারময় রে॥
হায় পাপে এই ভাবে, এখন সময় যাবে,
আর কত দিন বল বৃথায় কাটিবে রে।
এ যতনা বল আর কতই সহিবে রে॥
এখনও আছে সময়, ভাব সেই দয়াময়,
অবশ্য পাইবে তুমি আনন্দ অন্তরে রে।
দয়াময় নাম সদা কর অতঃপরে রে॥
ভক্তিভাবে ডাক তাঁরে, দেখিবে হৃদি মাঝারে,
পশিয়া নাশিবে, শান্তি, পাপ অন্ধকারে রে।
তাই বলি ভাব সেই জগত ঈশ্বরে রে॥
সে নাম জপিতে যদি, পার মন নিরবধি,
বিমল আনন্দে নৃত্য করিবে হৃদয় রে।
সে মধুর নাম মন, সদানন্দময় রে॥
বশে রাখি রিপুগণে, নিজে থাকি ঈশ সনে,
সতর্ক ধর্ম্মের চিন্তা কর অরে মন রে।
ধর্ম্ম পথে কত সুখ জানিবে তখন রে॥ অন্নপূর্ণা দেবী।

কেন কাঁদি।

আনন্দ সাগর এভব ভবন।
সুখে বিচরণ করে জীবগণ॥
চারিদিক দেখি সুখেতে মগন।
হাসি হাসি দিন করিছে ক্ষেপণ॥
আমি নিরন্ত করিব রোদন।
সুখের প্রভাত অরুণ উদয়।
মৃদু কিরণেতে পৃথিবী হাসায়॥
মধুর স্বরেতে বিহঙ্গম গায়।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে সব জীবগণ ধায়॥
মম অশ্রু ঝরি মেদিনী ভিজায়
আশার কুহকে ভুলি অনিবার।

সকলেই বলে আমার আমার।
জানে না ত্যজিবে সুখের সংসার।
সঙ্গে নাহি যাবে বন্ধু পরিবার।
কাঁদিবার তরে জনম আমার।

সায়াহ্নে তপন অস্তাচলে যায়।
বিরাম লভিতে জীবগণ ধায়॥
শ্রমদূর করে পশিয়া আলয়।
পরিবার হেরি প্রফুল্ল হৃদয়॥
মম মনে সুখ কিছুতে না হয়।

পূর্ণিমা তিথিতে সুনীল অম্বরে।
শশাঙ্ক উদেন গগণ মাঝারে॥
সুস্নিগ্ধ প্রভায় হাসায় ধরারে।
চকোর পুলকে সুধা পান করে॥
কেন কাঁদি হায় দুঃখিত অন্তরে।

আইল বসন্ত শোভিল সুন্দর।
সাজিল প্রকৃতি চিত্ত মুগ্ধকর॥
হেরি তরু লতা অতি মনোহর।
কল কণ্ঠ স্বরে বিরহী কাতর॥
মোর অশ্রুজল বহে অবিরল।

বরষাতে নদী জলে টল টল।
পূর্ণ যৌবনেতে করে ঢল ঢল।
সবল হৃদয় সতত চঞ্চল।
আদরে সমীর খেলায় কেবল॥
তথাপিও ঝরে নয়ন যুগল।

শরতের শশী শোভিয়া গগণ।
ধীরে ধীরে আসি হাসায় প্রাঙ্গণ॥
অসংখ্য তারকা হীরক মতন।
উজলিত করে সকল ভুবন॥
সে শোভায় আমি করি রে রোদন।

চাঁদের আলোক পাইয়া তখন।
পুলকে পূরিল কুমুদিনী মন॥
হাসি হাসি মুখে করিছে বরণ।
আদরেতে শশী দেয় আলিঙ্গন॥
হেরিয়া বিজনে কাঁদে মোর মন।

নাচিয়া নাচিয়া তরঙ্গিণী জল।
স্বাধীন ভাবেতে চলিছে কেবল॥
চিন্তাহীন হৃদি পবিত্র নির্ম্মল।
কুল কুল রবে হাসে খল খল॥
নেত্র নীরে মোর ভাসে গণ্ডস্থল।

একাকিনী বসি নির্জ্জনে যখন।
বঙ্গের হীনতা করিয়া স্মরণ॥
অন্ধকার হেরি সমস্ত ভুবন॥
নীরবেতে অশ্রু করি বরিষণ।
যে দুঃখেতে কাঁদে অন্তর আমার।
মনের যতনা জুড়াবেকুলা তার॥
সব সুখ এবে দিয়া বিসর্জ্জন।
অশ্রুবারি মাত্র বিভব এখন॥
নীরবে নির্জ্জনে যাইবে জীবন।

শান্তির কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন।
সংসারের সব জ্বালা ভুলিব তখন॥
শুকাইবে নেত্র জল জুড়াবো জীবন।
লভিব অনন্ত সুখ শান্তি নিকেতন॥

পাঠিকা।
দ্বারভাঙ্গা।

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS, No. 11, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.